অলংকরণ: অনুপ রায়

http://banglaebooksclassics.blogspot.com

উপন্যাস

বুনোহাঁস

সমরেশ মজুমদার

খিদিরপুরে শেষ কবে গিয়েছিল মনে নেই। বাস থেকে নেমে অমলের মনে হচ্ছিল, সে বিহার অথবা উত্তরপ্রদেশের কোনও শহরে পৌঁছে গিয়েছে।

বাসটা থেমেছিল খাল পেরিয়ে বাজারের পাশে। সেখান থেকে খানিকটা এগোতেই তিন মাথার মোড়টা দেখতে পেল অমল। এই মোড়েই তাকে আসতে বলেছিল রবীন। মোবাইলে সময় দেখল সে, এখনও দশ মিনিট বাকি আছে চারটে বাজতে।

রবীনের সঙ্গে অমলের দেখা হয়েছিল মাত্র গতকাল। ওরা কলেজ ছেড়েছে বছরআটেক হল। রবীন অবশ্য সেকেন্ড ইয়ারেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল। এলগিন রোডের মলে ডিউটি করছিল অমল। হঠাৎ নিজের নাম শুনতে পেয়ে পিছন ফিরে রবীনকে দেখতে পেয়েছিল। বেশ ঝকঝকে চেহারা, ফর্সাও হয়েছে। পরনে দামি জিন্স আর দামি শার্ট। বোঝাই যায়, ওর রোজগার ভাল।

রবীন বলল, "এ কী রে! তুই সিকিউরিটির চাকরি করছিস?"

"কিছুই তো পাইনি। একেবারে বসে থাকার চেয়ে কিছু তো আসছে," কথাগুলো বলতে অমলের সঙ্কোচ হচ্ছিল, কিন্তু বলে ফেলল।

"কিন্তু তোর বাবা তো নামী ডাক্তার ছিলেন, আছেন তো?"

"থাকবেন না কেন? ভালই আছেন।"

"তিনি জানেন?"

"আশ্চর্য! আমার তো খারাপ লাগছে না। একটু দাঁড়া," মলে ঢুকতে চাওয়া একজনের ব্যাগ চেক করে ছেড়ে দিয়ে বলল অমল, "তুই কী করছিস?"

"কন্ট্রাক্ট সার্ভিস!" রবীন জিজ্ঞেস করল, "কীরকম পাচ্ছিস?"

"হাত খরচের জন্য কারও কাছে হাত পাততে হয় না।"

"রাবিশ! তোর নিশ্চয়ই পাসপোর্ট নেই?"

"কেন?"

"না থাকাটাই স্বাভাবিক। নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট বাঙালির থাকে না। ওটা যে একটা মূল্যবান আইডেন্টিটি কার্ড, তা কেউ খেয়ালে রাখে না।"

"না রে! ঘটনাচক্রে আমার একটি পাসপোর্ট আছে। বছরপাঁচেক আগে যখন বিদেশে পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম, তখন অ্যাপ্লাই করে পেয়েছিলাম।"

"কোথায় পড়তে যেতে চেয়েছিলি?"

"ছাড় ওসব কথা।"

"আমেরিকায়?"

"নাঃ, সিডনিতে। নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটি। প্রচুর টাকা দরকার ছিল। বাবা সহযোগিতা করেননি," বলতে-বলতেও নিজের ডিউটি ঠিকঠাক করে যাচ্ছিল অমল।

"কাল তোর কখন ডিউটি?"

"কাল আমার অফ ডে।"

"গুড। এক কাজ কর। ঠিক চারটের সময় খিদিরপুরের খালব্রিজ পেরিয়ে যে তেমাথার মোড় আছে, সেখানে চলে আয়," রবীন বলেছিল।

"কেন?" অবাক হয়েছিল অমল।

"আরে, আয় না। তখন বলব!" রবীন চলে গিয়েছিল।

মোড়ের ফুটপাথে বিচিত্র দোকান। তার খদ্দেররা সবাই অবাঙালি। এই রকম জায়গায় রবীন তাকে কেন আসতে বলল, বুঝতে পারছিল না অমল। আজ তার ছুটির দিন। বিছানায় আধশোওয়া হয়ে বই পড়ার আরাম ছেড়ে এত দূরে আসতে ইতিমধ্যে দশ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে! কলেজের প্রথম বছরে রবীন খুব সরল তরুণ ছিল বলে ওদের বন্ধুত্ব ভাল জমেছিল। সেই স্মৃতি মরে যায়নি বলেই আজ চলে এসেছে অমল। কিন্তু গতকালই তার মনে হয়েছিল, রবীন বদলে গিয়েছে অনেক।

একটা মোটরবাইকে চেপে রবীন এল। বেশ মূল্যবান বাইক।

"উঠে পড়," রবীন চেঁচাল।

"হেলমেট?" বাইকের পিছনে উঠে অমল জিজ্ঞেস করল।

"এই এলাকায় নো প্রবলেম!"

বাইক গতি নিল। আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল অমল। ক্যালকাটা হাসপাতালের কাছে গিয়ে বাইক থামাল রবীন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, "নেমে দাঁড়া। কথা আছে।"

অমল নামতেই সে বলল, "আমি যে কন্ট্রাক্ট সার্ভিস করি, তুই তা করবি?"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"সেটা পরে বোঝাচ্ছি। আপাতত মাসে দশ বার তোকে কাজটা দেবে। যা ঠিকঠাক করলে তুই তিরিশ হাজার পাবি!" রবীন বলল।

"কী বলছিস? অত টাকা?" চোখ বড় হয়ে গেল অমলের।

"যে ক্যাটিগরিতে তোকে কাজ দেবে, সেই কাজ অন্য ছেলে করে উনচল্লিশ থেকে বেয়াল্লিশ রোজগার করে। আমি দু' বছর আগে ওই কাজ করতাম, এখন..." শেষ না করে হাসল রবীন।

"কী কাজ করতে হবে যার জন্য এত কাজ করতে হবে?"

পকেট থেকে দামি সিগারেটের প্যাকেট বের করে রবীন ইশারা করল নেওয়ার জন্য, অমল মাথা নেড়ে না বলল। সিগারেটে লাইটারের আগুন ছুঁইয়ে ধোঁয়া ছেড়ে রবীন বলল, "তোকে বিদেশে যেতে হবে। আপাতত মাসে দশবার। ঘাবড়াস না, যাতায়াতের প্লেনভাড়া, থাকা খাওয়ার জন্য তোকে একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না। পেমেন্ট পার ডে নিতে পারিস, মান্থলিও। সেটা তোর ইচ্ছে। খুব সহজ ব্যাপার।"

"আমি কোনও দিন বিদেশে যাইনি," দুর্বল গলায় বলল অমল।

"অনেক কিছুই তো আমরা প্রথম করি। তাই না? কলেজে ঢোকার পর প্রথম সিগারেট খেয়েছিলাম। প্রথমবার বিদেশে গিয়ে এক পেগ ভদকা খেয়েছিলাম, যা আগে কখনও খাইনি। লোকে বিয়ে করার আগে কি ভাবে যে, আমার কোনও এক্সপিরিয়েন্স নেই তাই বিয়ে করব না!" হাসল রবীন।

"কী করতে হবে তা তুই পরিষ্কার করে বল," অমল বলল।

"কিছুই না। তোর সঙ্গে আরও কিছু ছেলে যাবে। এয়ারপোর্ট গিয়ে টিকিট দেখিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ফর্ম ভর্তি করে ইমিগ্রেশনে চলে যাবি। যাওয়ার সময় কাস্টমস কিছুই বলবে না। উপরে উঠে সিকিউরিটি চেকিংয়ের পর প্লেনে উঠে বসবি। আসবার সময় জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসবি, কেউ কিছু বলবে না। এয়ারপোর্টের বাইরে গাড়ি থাকবে। নো প্রবলেম!"

"আমাকে কোথায় যেতে হবে।"

"হয় ব্যাঙ্কক, নয় সিঙ্গাপুর। ব্যাঙ্ককেই বেশি যেতে হয়। আমি অবশ্য এখন চিনেও যাই। ফলে বেশি পেমেন্ট দেয় আমাকে।"

"ওখানে গিয়ে কী করব?"

"এয়ারপোর্ট থেকে অফিসে চলে যাবি। খেয়ে-দেয়ে লম্বা ঘুম। সন্ধে নাগাদ তোকে জিনিসপত্র দিয়ে দেবে। তাই নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এসে প্লেনে উঠে বসবি। কেউ তোকে কিছু বলবে না," রবীন বলল।

"কী জিনিসপত্র?"

"ওসব ভাল করে প্যাক করা থাকবে। যখন কেউ কিছু বলবে না, তখন তোর জানার কী দরকার ভিতরে কী আছে?"

"যদি অবৈধ জিনিস থাকে?"

"অমল, এই কলকাতা শহরে বাঁচার জন্য কি আমরা অবৈধ কাজ করি না? ইলেকট্রিক বিল যাতে কম আসে, তার জন্য মিটারে না ওঠার যন্ত্র বেরিয়ে গিয়েছে। অনেকেই সেটা লাগিয়ে রাখে। শুধু সপ্তাহে সাপ্লাইয়ের লোক মিটার দেখতে আসে সেই সপ্তাহে যন্ত্রটা খোলা রাখে। এটা তো খুবই অবৈধ ব্যাপার। তবু তো পাবলিক করছে। ব্ল্যাকে কেরোসিন কিনছে, ট্রেনের কন্ডাক্টর-গার্ডকে ঘুষ দিয়ে জায়গা নিচ্ছে, কর্পোরেশন ইনকাম ট্যাক্সে টাকা ঢেলে কাজটা করিয়ে নিচ্ছে, এগুলো অবৈধ নয়?" রবীন রেগে গেল।

"আমাকে একটু ভাবতে দে," অমল বিড়বিড় করে বলল।

"এই জন্যই বলে, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি। অথচ নন-বেঙ্গলি ছেলেরা দলে-দলে এই লাইনে চলে এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এম এ পাশ, কেউ কেউ ল-পাশ করেছে!" রবীন বলল।

অমল কিছু বলল না। ব্যাপারটা ভাবতেই পারছিল না সে।

রবীন বলল, "এক কাজ কর। ওই উল্টো দিকের গলিতে আমার বসের বাড়ি। এত দূর এসেছিস যখন, তখন আলাপ করে যা। আমি ফোনে তোর কথা ওঁকে বলেছিলাম, না নিয়ে গেলে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরে ঠিক করবি হাতের বলটা পায়ে ঠেলবি কিনা!"

"ঠিক আছে, চল," এটুকু করলে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ভাবল অমল।

রবীন এবার খুশি হল, "ওই সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করে কত পাস? চার, পাঁচ হাজার? এখানে শুরুতেই তিরিশ হাজার! জীবনটা একদম বদলে যাবে রে অমল। পরে তোকে স্বীকার করতেই হবে। ওঠ।"

উল্টো দিকের গলিতে খানিকটা যাওয়ার পর একটা বেশ পুরনো বাড়ির সামনে বাইক থামাল রবীন। বাড়ির বাইরেটা উত্তর কলকাতার আদ্যিকালের বাড়ির মতো। দরজায় উর্দিপরা সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়েছিল যে রবীনকে চেনে। তাই সিঁড়িতে পা রাখতে অসুবিধে হল না। সিঁড়ির উপরে আর একজন উর্দিপরা লোক দাঁড়িয়ে। রবীন তাকে বলল, "ম্যাডামকে খবর দাও।"

লোকটা বলল, "আপনাকে ভিতরে যেতে বলেছেন ম্যাডাম, যান।"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। যন্ত্র ঘরটাকে একটু বেশি ঠান্ডা করে রেখেছে। ঘরের একপাশে বসার জন্য চমৎকার সোফাসেট। অন্য দিকে বড় টেবিলের এক পাশে কম্পিউটার, কয়েকটা ফাইল, টেলিফোন। টেবিলের ওপাশে দামি গদিওয়ালা চেয়ার, এপাশের তিনটে সাধারণ মানের।

রবীন বলল, "এখান থেকেই ম্যাডামের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।"

"তোর বস কি মহিলা?" অমল তাকাল।

আরও গলা নামাল রবীন, "পুরুষের বাবা। শোন, এখানকার কোনও

ব্যাপারে তুই একটুও কৌতূহল দেখাবি না। যদি কাজ করিস, তা হলে যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হবে, শুধু সেটুকুই করবি। ম্যাডাম ছাড়া আর কাউকে তুই চিনবি না, এমনকি আমাকেও না।"

অমলের মনে হচ্ছিল, রবীন তাকে একটা রহস্যময় জগতে নিয়ে এসেছে। সে অনুমান করল, এই জগতের সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক আছে। ম্যাডাম এসে যা বলেন, তা সে শুনে যাবে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে রবীনকে বলে দেবে, তার পক্ষে এখানে কাজ করা সম্ভব নয়।

মিনিটপাঁচেক পর যে ভদ্রমহিলা ঘরে এসে টেবিলের উল্টোদিকের গদিওয়ালা চেয়ারে বসলেন, তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুব ফর্সা, কিন্তু লম্বা শরীরে মেদের আধিক্য আছে। পরনে নীল শাড়ি। মুখটি চর্বি সত্ত্বেও সুন্দর। রবীন অমলের পরিচয় দিল। ভদ্রমহিলা হাসলেন। অমলের অস্বস্তি হচ্ছিল, কারণ ওঁর দৃষ্টি তার মুখ থেকে সরছে না।

"তোমার বাড়িতে কে কে আছে?" প্রশ্নটা ইংরেজিতে করলেন ম্যাডাম।

ইংরেজি লেখা ও পড়ায় অমলের অসুবিধে হয় না। কিন্তু আর পাঁচটা বাঙালি ছেলের মতো বলার সময় আড়ষ্টতা আসে। তবু ইংরেজিতেই জবাব দিল সে।

"তোমার বাবা কী করেন?"

অমল উত্তর দিল।

তারপর একে-একে প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হল। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কত? তারা কী করে? এখন সে কোনও কাজ করছে কিনা? কত মাইনে পাচ্ছে? তার পাসপোর্ট আছে কিনা? থাকলে কবে এক্সপায়ার্ড হবে? বিদেশে গিয়েছে কিনা? একা বিদেশে যেতে অসুবিধে আছে কিনা? তারপর প্রশ্ন হল, "অমল তুমি কি বিবাহিত?" জবাব শুনেই জিজ্ঞেস, "তোমার কি স্টেডি গার্ল ফ্রেন্ড আছে?"

কী উত্তর দেবে, বুঝতে পারছিল না অমল। সোহাগকে কি গার্ল ফ্রেন্ড বলা যাবে? অথচ সোহাগই একমাত্র মেয়ে যার সঙ্গে তার নিয়মিত কথা হয়।

ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "ভাবতে হচ্ছে কেন?"

অমল হাসল, "স্টেডি গার্ল ফ্রেন্ড মানে?"

"ওয়েল, যাকে নিয়ে তুমি স্বপ্ন দ্যাখো, যার সঙ্গে বাকি জীবনটা থাকার কথা ভাবো, যার সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠ হও..."

"না, সেরকম কেউ আমার জীবনে নেই," অমল বলল।

"ঠিক আছে অমল, তোমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর এখানে লিখে দাও," একটা ছোট প্যাড আর কলম এগিয়ে দিলেন ম্যাডাম। অমল লিখে দিলে ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, "বাঃ, তোমার হাতের লেখা বেশ সুন্দর। তুমি, নেক্সট সোমবার এই সময় হয়তো ফোন পাবে। ফোনের কাছে থেকো। বাই!" এমন চটজলদি ম্যাডাম শেষ শব্দটা উচ্চারণ করলেন বুঝতে একটু দেরি হল অমলের।

রবীন বলল, "তা হলে তুই চলে যা। পরে দেখা হবে।"

নীচে নেমে এসে অমল কিছুক্ষণ চুপচাপ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রমহিলার নাম সে জানে না, কী কাজ করতে হবে, তা-ও তিনি বলেননি। তাকে শুধু প্রশ্নই করে গিয়েছেন, কাজের প্রসঙ্গে যাননি। অথচ রবীন তো কাজের জন্যই তাকে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মোবাইলটা পকেটে জানান দিচ্ছিল, এখন টের পেয়ে ওটা বের করে বোতাম টিপল সে, "হ্যাঁ, বলো।"

"কী করছ?" সোহাগের গলা।

"একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম," অমল বলল।

"ও মা! বলোনি তো কী চাকরি?"

"সেটা এখনও ঠিকঠাক জানি না।"

"এ আবার কী কথা?"

"আমার কলেজের এক বন্ধু নিয়ে এসেছিল খিদিরপুরে। যিনি চাকরি দেবেন, তিনি আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। যদি পাশ করি, তা হলে তিনি সামনের সোমবার আমাকে ফোন করবেন। তখন বোধ হয় দ্বিতীয় ইন্টারভিউ হবে।"

"কী আশ্চর্য! চাকরিতে কী করতে হবে, তা বলেননি?"

"না।"

"তোমার শরীর ভাল আছে তো?"

"খুব ভাল।"

"জানো, আমার এবার একটু ভয় করছে!" সোহাগ বলল।

"কেন?"

"কাল সকাল ন'টায় আবার রক্ত নিতে আসবে।"

"আবার? কেন?"

"ডাক্তার বলেছেন, তিন মাস অন্তর চেক করাতে হবে।"

"ও। এবার ভয় করছে কেন?"

"কী জানি?"

"ঠিক আছে। কাল যখন রক্ত নেবে, আমি তখন তোমাদের বাড়িতে যাব। আমি জানি, তোমার কিছুই হয়নি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, রাখছি।"

মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটতে শুরু করল অমল। সামনেই একটা ট্রাম পেয়ে উঠে জানলার পাশের সিটে বসে পড়ল। একদম ফাঁকা এই ট্রাম ধর্মতলায় যাচ্ছে।

সোহাগের দাদা শোভন অমলের স্কুল-জীবনের বন্ধু। চার বছরের ছোট-বড় ওরা। ক্লাশ টেনের ছাত্রী যখন তখন একদিন আচমকা স্কুলের দোতলা থেকে নামার সময় সিঁড়ির ধাপ গড়িয়ে নীচে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। পা ভাঙে, মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত পায়। কিন্তু সেই সঙ্গে নাক ও কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। তখনই ডাক্তাররা আবিষ্কার করেন, ওর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কমে গিয়েছে। রক্ত আরও তরল হয়ে গিয়েছে। প্লাস্টার পায়ে করা গেলেও মেরুদণ্ডে একটা জরুরি অপারেশন দরকার ছিল, যা শরীরের ওই অবস্থায় করা সম্ভব ছিল না। শুরু হল লিউকোমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই। হুইলচেয়ারে বসে সেই লড়াই করে যাচ্ছে সোহাগ। মাঝে-মাঝেই তাকে রক্ত দিতে হচ্ছে। বোন ম্যারোর প্রতিস্থাপন সফল হওয়ায় মৃত্যুর আশঙ্কা এখনই নেই। শোভন কম্পিউটারে মাস্টার্স করে চলে গিয়েছে হায়দরাবাদে বিপুল মাইনের চাকরি নিয়ে। বোনের চিকিৎসার জন্য ভাল সাহায্য করে বলে সোহাগের মা মেয়েকে যুদ্ধ করার অস্ত্র জোগাতে পারছেন।

মাঝে-মাঝে, ডিউটি না থাকলে অমল শোভনদের বাড়িতে যায়। সে গেলে যে সোহাগ খুশি হয়, তা ওর বাবা-মা জানেন। সারা শরীর নীল আলখাল্লায় ঢাকা, মাথায় নীল রুমাল বেঁধে হুইলচেয়ারে বসে তাকে দেখলেই হেসে ওঠে সোহাগ, গলা তুলে চেঁচায়, "মা, অমল এসেছে।"

মায়ের গলা ভেসে আসে, "এসো অমল, আমি চা নিয়ে আসছি।"

এর আগের দিন ওই বাড়িতে গিয়ে সোহাগের মুখে ওর বান্ধবী রীতার কথা শুনেছিল অমল। রীতার সঙ্গে একটি ছেলে ভাব করতে চেয়েছিল বলে এই ২০১২ সালেও তার অভিভাবকরা মেয়েটির কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে। তাকে ফোন করে নিশ্চিত হয়ে রীতার মা মেয়েকে রিসিভার দিয়েছিল।

অমল হেসে বলেছিল, "মেয়েটা অতিরিক্ত নরম। এখনকার যে-কোনও মেয়ে তো প্রতিবাদে ফেটে পড়ত।"

"সবাই পারে না," সোহাগ বলেছিল।

"রাস্তাঘাটে অল্পবয়সি মেয়েদের দেখে অবশ্য তা মনে হয় না!"

"তুমি এখন রাস্তাঘাটে মেয়েদের লক্ষ করা শুরু করেছ?" বেশ শব্দ করে হাসল সোহাগ, "আচ্ছা, এই যে তুমি মাঝে-মাঝে আমার কাছে আসছ, গল্প করছ, মা চা খাওয়াচ্ছে, আমি যদি সুস্থ, স্বাভাবিক মেয়ে হতাম, তা হলে কি এটা সম্ভব হত?"

"মানে?" হকচকিয়ে গিয়েছিল অমল।

"আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন তুমি, 'কী কেমন আছ' বলে দাদার ঘরে চলে যেতে। এখন তো দাদা নেই, আমার কাছেই আস। মা-বাবা এটা অ্যালাও করার উদারতা দেখাচ্ছে শুধু আমার অসুস্থতার কারণে। ওরা জানে, তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক কখনও তৈরি হবে না। তাই তুমি এলে যদি আমার ভাল লাগে, তা হলে ওটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চান না," সোহাগ বলেছিল ধীরে-ধীরে, একটু ভেবে-ভেবে।

অমল জানে, সোহাগের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ কখনও এক হবে না। কিন্তু একথাও সত্যি, পৃথিবীতে ও-ই একমাত্র মানুষ, যাকে সব কথা বলা যায়!

ঠিক সময়ে ফোনটা এল সোমবার সকালে। একটি পুরুষকণ্ঠ যাচাই করল সে অমল কিনা, তারপর জানাল, আজ বেলা তিনটের সময় ম্যাডাম দেখা করতে বলেছেন। সে যেন পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে যায়।

ফ্যাসাদে পড়ল অমল। আজ তার সিকিউরিটির ডিউটি বেলা দুটো থেকে। দশ মিনিট আগে পৌঁছে ইউনিফর্ম পরে নিতে হয়। ম্যাডাম যদি বারোটার সময় যেতে বলতেন, তা হলে দু'দিক সামলানো যেত। মোবাইলে নম্বরটা উঠেছে। ওই লোকটিকে ফোন করবে কিনা, ভাবল অমল। তারপর রবীনের কথা মনে এল। রবীনের মোবাইল নম্বর চাওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত

সিকিউরিটি গার্ডের অফিসে ফোন করল সে। ছুটি চাই শুনে ম্যানেজার রেগে আগুন। তখন বাধ্য হয়ে মিথ্যে বলল অমল। তার এক আত্মীয়ের অপারেশন হচ্ছে দুপুরে, তাকে থাকতেই হবে। শুনে ভদ্রলোক বললেন, "যেহেতু তুমি এর আগে আচমকা ছুটি চাওনি, তাই এবার তোমাকে ছাড়ছি। এর পরে অন্য কারও অসুস্থতার জন্য ছুটি চাইলে তোমাকে আর কাজ করতে হবে না।"

মিথ্যে কথা সাধারণত বলে না অমল। এখন বলার পর খুব খারাপ লাগছিল। সে সোহাগকে ফোন করল। সোহাগের ফোন সুইচড অফ। কথামতো সোহাগের রক্ত নেওয়ার দিন সে গিয়েছিল। ওর বাবা-মাও সামনে ছিলেন। এতবার রক্ত পরীক্ষা হয়েছে, ওর তবু প্যাথলজিস্টের সহকারী যখন তুলো দিয়ে হাতের চামড়া মুছে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বের করল, তখন সে চোখ বন্ধ করে মাকে জড়িয়ে ধরল। পরের দিনই রিপোর্ট এসেছিল, হিমোগ্লোবিন একটু বেড়ে ছয়-এ পৌঁছেছে। সাধারণত সোহাগ মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখে না। অস্বস্তি হচ্ছিল অমলের।

ঠিক তিনটের সময় খিদিরপুরের সেই বাড়িটার দরজায় পৌঁছে গেল অমল। নীচে দাঁড়ানো গার্ড তাকে দেখে ইশারায় উপরে যেতে বলল। অর্থাৎ, তাকে যে আসতে বলা হয়েছে, তা লোকটা জানে। দোতলার লোকটা তাকে দেখে হাসল। তারপর ইশারায় দাঁড়াতে বলে বন্ধ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অমল কাকের ডাক শুনতে পেল। একা একটা কাক চেঁচিয়ে যাচ্ছে। লোকটা বেরিয়ে এসে দরজা আধখোলা রেখে ইশারা করল ভিতরে যেতে।

আজ ম্যাডাম তাঁর চেয়ারে বসে ফোনে কথা বলছেন। ইশারা করলেন, উল্টোদিকের চেয়ারে বসার জন্য। অমল সোজা হয়ে বসে ম্যাডামকে লক্ষ করল। আজ তাঁর পরনে সাদা আলখাল্লা। গলার কাটাটা একটু বেশি বড় বলে, বুকের আদল ঈষৎ দেখা যাচ্ছে।

ফোন বন্ধ করে ম্যাডাম বললেন, "অমল, তোমার সম্পর্কে আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম, তুমি আমাকে যা বলেছ, তাতে মিথ্যে নেই! গুড! এখন বল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক?"

"কাজটা কী, তা আমি পরিষ্কার জানি না," অমল বলল।

"সে কী! রবীন তো তোমাকে বলেছে?" ম্যাডামের কপালে ভাঁজ।

"পুরোটা বলেনি।"

"ওয়েল," ম্যাডাম বললেন, "তোমাকে আমরা বিদেশে পাঠাব। সেসব দেশে, যেখানে আজ রাতে গিয়ে কাল রাতে ফিরে আসা সম্ভব। তোমার যাবতীয় খরচ আমাদের। শুধু ফিরে আসার সময় তুমি ২০ কেজির প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে আসবে। এটা লাগেজে দেবে, পাঁচ কেজি তোমার হ্যান্ডব্যাগে রাখবে, যা হাতে ক্যারি করবে," ম্যাডাম বললেন।

"প্যাকেটে কী থাকবে?"

"দ্যাখো, এই প্রশ্ন তোমাকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে!"

"কিন্তু পুলিশ যদি প্যাকেট খুলে দেখতে চায়..."

হাসলেন ম্যাডাম, "বিদেশ থেকে যারা আসে, তাদের জিনিসপত্র চেক করতে পুলিশ যায় না! যারা চেক করতে পারে, তারা যদি ডিস্টার্ব না করে, তা হলে প্যাকেটের ভিতরে কী আছে, তা তোমার জানার দরকার হবে না। অবশ্য কখনও-কখনও অবস্থার পরিবর্তন হতেই পারে। সেরকম হলে দমদমে যখনই প্লেন ল্যান্ড করবে, তখনই তোমাকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে। তুমি তোমার হ্যান্ডব্যাগটা প্লেনেই ফেলে রেখে আসবে, বেল্ট থেকে লাগেজ তুলবে না। লাগেজ ট্যাগটা তোমার বোর্ডিং পাসে আটকে দেবে আসার সময়। ফোন পেলে ট্যাগটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে কেউ তোমাকে টাচ করতে পারবে না। আর হ্যাঁ, মাসে তোমাকে আমরা বারদশেক বিদেশে পাঠাব। প্রতিবারের জন্যে তুমি তিন হাজার টাকা পাবে। এয়ারপোর্টের বাইরে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। তাকে প্যাকেটগুলো বুঝিয়ে দিলেই হবে। পেমেন্ট পরের দিন এসে নিয়ে যাবে। বুঝেছ?"

"ম্যাডাম, আমি বিপদে পড়ব না তো?"

"দ্যাখো অমল, এই মুহূর্তে আমার কাছে ছ'জন ছেলে কাজ করছে। রবীন এখন চায়নায়। আজ ব্যাঙ্কক হয়ে ফিরবে। এদের কেউ যতক্ষণ বিশ্বাসঘাতকতা না করছে, ততক্ষণ তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। তোমার পাসপোর্ট এনেছ?" হাত বাড়ালেন ম্যাডাম।

পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে এগিয়ে দিল অমল। সেটা তুলে পাতা উল্টাতে-উল্টাতে ম্যাডাম হাসলেন, "ভার্জিন!"

হঠাৎ অমল জিজ্ঞেস করল, "কাজটা কত দিনের?"

"ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমি জানি না। যত দিন সব ঠিকঠাক থাকবে, যে জিনিসগুলো তোমরা নিয়ে আসবে, তার ডিমান্ড এখানকার বাজারে যত দিন থাকবে, তত দিন আমরা কাজ করে যাব। দ্যাট্স অল!"

"এখন আমাকে কী করতে হবে?"

"তুমি কখনও বিদেশে যাওনি। তাই আমি চাইছি, তোমার হাতেখড়ি ঢাকা থেকে শুরু হোক। ওখানে তোমার ভাষার সমস্যা হবে না। তোমার ভিসা কালই হয়ে যাবে। কাল বিকেলে, এই ধরো পাঁচটা নাগাদ, আমার পাশের বাড়ির দোতলায় মিস্টার আহমেদের সঙ্গে দেখা করবে। ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এসেছিল অমল। তার মাথার ভিতরে কোনও ভাবনাই স্থির হচ্ছিল না। সে সোহাগকে ফোন করল। ফোনটা এখনও বন্ধ।

খিদিরপুর থেকে ধর্মতলা হয়ে সোজা সোহাগদের বাড়িতে চলে এল অমল। উত্তর কলকাতার একটা নির্জন রাস্তার ধারে সোহাগদের পুরনো বাড়ি। আগে দিনের বেলা মাঝে-মাঝে হকারের হাঁক ছাড়া কোনও শব্দ শোনা যেত না ওই পাড়ায়।

কাজের লোক দরজা খুললে অমল জিজ্ঞেস করল, "সোহাগ কি জেগে আছে?"

"হ্যাঁ। উপরে যান।"

দোতলায় উঠেই সোহাগের মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, "এসো। কেমন আছ?"

"ভাল। সোহাগের ফোন সুইচড অফ কেন মাসিমা?"

ভদ্রমহিলা হাসলেন, "যাও, গিয়ে ওর মুখ থেকেই শোনো।"

বিছানায় আধো শুয়ে থাকা সোহাগকে খুব ফ্যাকাসে। ওকে দেখতেই মিষ্টি হাসল, "ফোন করেছিলে?"

"হ্যাঁ। বন্ধ করে রেখেছ কেন?" অমল চেয়ার টেনে বসল।

"বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাত থেকে পড়ে গিয়ে চৌচির হয়ে গিয়েছে যন্ত্রটা।"

"সে কী!"

"আজই আর একটা এনে দেবে বাবা। তোমার খবর কী বলো!"

সোহাগের দিকে তাকাল অমল। তারপর হেসে বলল, "একটা চাকরি পেয়েছি!"

"অ্যাঁ? বাঃ! বলোনি তো?" চেঁচিয়ে উঠল সোহাগ। বোধ হয় সেটা কানে যাওয়ায় ওর মা ঘরে ঢুকলেন, "কী হল?"

"মা, অমলদা চাকরি পেয়েছে," খুশিমুখে জানাল সোহাগ।

"তাই?" মা তাকালেন।

"আমাকে এই মাত্র বলল!"

অমল বলল, "আরে, চাকরির চেষ্টা করি আর হয় না বলে তোমাকে কিছু বলিনি। অফারটা পাকা হয়ে গেল, তাই জানালাম।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "চাকরিটা কলকাতায় তো?"

"কলকাতায়। তবে প্রায়ই বাইরে যেতে হবে," বলতে গিয়ে অমলের মনে হল, কতটা বলা উচিত, তা তার মাথায় ঢুকছে না।

"ট্যুরে?" সোহাগ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, ওরকমই।"

"কত মাইনে?" মা জানতে চাইলেন।

"তিরিশ হাজার!" সত্যি কথাটা বলে ফেলল অমল।

"অ্যাঁ? অত টাকা!" মায়ের চোখ বড় হয়ে গেল।

"ওই ট্যুরের জন্যই..."

"বাঃ! তুমি তো এখন বড় লোক হয়ে যাবে! খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

"তোমার তো খাওয়াদাওয়ার উপর বাধানিষেধ আছে," অমল কথাটা বলতেই মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

"তা আছে," মাথা নাড়ল সোহাগ, "আচ্ছা, এত মাইনে দিচ্ছে, তোমাকে দিয়ে কী কাজ করাবে?"

"আমি এখনও পরিষ্কার জানি না। তবে বলেছে, আমাকে মাসে দশবার দিনকুড়ির জন্য বিদেশে যেতে হবে!" অমল না বলে পারল না।

"বিদেশে? কোথায়?" সোহাগ অবাক।

"বেশি দূর নয়। ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, এসব জায়গায়।"

"গিয়ে কী করতে হবে?"

"ওখানকার অফিস থেকে জিনিসপত্র আনতে হবে।"

"তার জন্য তোমাকে পাঠাচ্ছে কেন? ওরা তো প্লেন বা জাহাজে নিয়ে আসতে পারে। কোনও গোলমাল নেই তো?" মুখ শুকিয়ে গেল সোহাগের।

"না, না। এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।"

"তা হলে তোমার সঙ্গে অনেকদিন কথা হবে না।"

"আশ্চর্য! আমি বাইরে গিয়েও তো ফোন করতে পারি?"

আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা বলে বিদায় নিয়ে সোহাগদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অমল। এখন বেশ হাল্কা লাগছে। সোহাগকে কখনও মিথ্যে বলেনি সে। যেটুকু জানে, তাই আজ ওকে বলার পর তার ভাল লাগছে। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার আগেই তার মোবাইল ফোন বেজে উঠল। নম্বরটা পরিচিত নয়। অন করে হ্যালো বলতেই সোহাগের মায়ের গলা কানে এল, "অমল, তোমার সঙ্গে সোহাগের কি কোনও ঝামেলা হয়েছে?"

"ঝামেলা? না তো! ঝামেলা হবে কেন?" পাল্টা প্রশ্ন করল অমল।

"আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলে ও বলছে না।"

"আপনার এরকম মনে হচ্ছে কেন?"

"তুমি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ওর কাছে গিয়ে দেখলাম, নাকের নীচে ফ্রেশ রক্ত লেগে আছে। ডাক্তার বলেছেন, উত্তেজিত হলে ওর নাক বা কান দিয়ে ব্লিডিং হতে পারে। আমি ডাক্তারকে ফোন করেছি। কিন্তু ভাবলাম, তোমাকে জিজ্ঞেস করি তেমন কিছু হয়েছিল কিনা?" সোহাগের মা বললেন।

"না। মাসিমা, কিছুই হয়নি।"

"তা হলে কেন হল?"

"আমি জানি না। ও এখন কেমন আছে?"

"শুয়ে আছে। ডাক্তারবাবু আসুন...আচ্ছা।"

লাইন কেটে গেল। যন্ত্রটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল অমল। হঠাৎ মনে হল, তার চাকরির ব্যাপারটা কি ভাল মনে নিতে পারেনি সোহাগ? ও কি কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করে ভিতরে-ভিতরে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল? অনেকদিন কথা হবে না বলেছিল, কিন্তু সেটা তো সত্যি নয়। এই কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও রোজ যে কথা হয়, তেমন নয়। তা ছাড়া সোহাগের সঙ্গে সে কখনই হৃদয়ঘটিত সম্পর্কে জড়িত হয়নি। তা হলে?

বাড়িতে চাকরির কথা বলল অমল। মা খুব খুশি হলেন মাইনের অঙ্কটা শুনে। বউদি তো বিশ্বাসই করছিল না। দাদা বলল, "বিদেশে গেলে একটাই সুবিধে। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। যোগাযোগ বাড়লে আরও ভাল চাকরি পাওয়া যায়।" অমল লক্ষ করল, কাজটা ভাল না মন্দ, তা নিয়ে এদের কেউ কোনও কথা বলল না। কিন্তু বউদির ব্যবহার যেন ডিগবাজি খেল। গত কয়েক বছরে বউদিকে অমলের খাওয়ার সময় ধারেকাছে দেখা যেত না। ঠান্ডা হয়ে যাওয়া খাবার মা গরম করে দিত। ভুলেও তার ঘরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢোকেনি ভদ্রমহিলা। উল্টে দাদার কাছে মাঝে-মাঝে শুনতে হয়েছে, "অত দেরি করে না খেলেই কি চলে না? তোর বউদির অস্বস্তি হয়।"

তার দেরিতে খাওয়ার সঙ্গে বউদির স্বস্তি বা অস্বস্তির কী সম্পর্ক, তা মাথায় না ঢুকলেও, কথা বলেনি অমল। অস্বস্তি বা অসুবিধে হলে তা মায়ের হত। বাড়িটা যেহেতু বাবা তৈরি করে গিয়েছিলেন এবং এখন মায়ের নামে আছে, তাই এখানে থাকার অধিকার অমলের আছে। সে টিউশনি শুরু করার পর থেকে মায়ের হাতে কিছু দিত। আর এই সিকিউরিটি সার্ভিসের কাজটা পাওয়ার পর তো মাসে দেড় হাজার টাকা দিতে শুরু করেছিল। তার ধারণা, সকালের চা-বিস্কুট আর দু'বেলার সামান্য খাওয়া ওই টাকাতে হয়ে যাওয়া উচিত।

দুপুরের খাওয়া একটু আগে খেয়ে নিয়েছিল সে। খেতে বসে মাছের সাইজ দেখে অবাক হয়ে পাশে বসা মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "হঠাৎ এত বড় মাছ?"

মা মৃদু হেসে বলল, "খেয়ে নে!"

বিকেল চারটে নাগাদ খিদিরপুরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল অমল, দরজার বাইরে বউদির গলা, "আসব?"

"হ্যাঁ," অমল অবাক হয়ে দেখল, চায়ের কাপ হাতে বউদি ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর রাখল, "মায়ের কাছে শুনলাম, তুমি চারটের সময় বেরিয়ে যাবে। কী, চাকরির ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ," চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে আয়নায় নিজেকে দেখল অমল।

"কবে জয়েন করবে?"

"আজ গেলে জানতে পারব।"

বউদি হেসে বলল, "অ্যাদ্দিনে চিন্তাটা দূর হল।"

"কী ব্যাপার?"

"আর বোলো না। এই বাড়িতে ঘর তো মোটে চারটে। তাও ছোট-ছোট। বাড়িটাও পুরনো হয়ে গিয়েছে, সারাতে গেলে লাখদু'য়েক খরচ। তার উপর কাউকে বাড়িতে ডেকে আপ্যায়ন করা যায় না। ভাল লাগে, বলো? তোমার দাদার খুব ইচ্ছে, একটা বড় ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকার। কলকাতার মধ্যে তো কেনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কবি নজরুল স্টেশন থেকে মিনিটদশেকের মধ্যে তিরিশ লাখ টাকায় একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যাচ্ছে। তিনটে ঘর, বড় হল ঘর, প্রতিটি ঘরে অ্যাটাচড বাথ, একটা ব্যালকনিও আছে। পনেরো লাখ টাকা দিতে হবে প্রথমে। বাকিটা মাসিক ইনস্টলমেন্টে। এই বাড়ি বিক্রি করলে লাখ কুড়ির বেশি পাওয়া যাবে না। বাকি দশ লাখ টাকা সুদসমেত মেটাতে গেলে মাসিক কিস্তি যা লাগবে, তা এতদিন তোমার দাদার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তোমার চাকরির কথা শুনে মানুষটার মুখে হাসি ফুটেছে। ও মা, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যে?" বউদি ব্যস্ততা দেখাল।

অমলের মনে হল, জীবনের সবচেয়ে স্বাদহীন চা সে এখন খাচ্ছে!

খিদিরপুরে ম্যাডামের পাশের বাড়িটা তিন তলা। তার দোতলায় 'ইন্টারন্যাশন্যাল ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট' লেখা সুন্দর বোর্ড ঝুলছে। গোটাচারেক ছেলে প্রথম ঘরে বসে নিজেদের মধ্যে মশকরা করছিল। ওরা কথা বলছিল হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে। প্রত্যেকের বয়স ত্রিশের আশেপাশে। বেয়ারা গোছের লোকটি তার নাম জেনে, সেখানে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে গেল। ঘরটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত। অমল উল্টো দিকের সোফায় বসতেই চারজন তাকে লক্ষ করল। তারপর একজন জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে আগে কখনও দেখিনি। নতুন নাকি?"

অমল কোনও কথা বলার আগেই বেয়ারাটি এসে তাকে বলল, "ভিতরে যান।"

সঙ্গে-সঙ্গে ওই চারজন প্রতিবাদ করে উঠল, "ওকে আগে ডাকছ কেন? আমরা পনেরো মিনিট ধরে অপেক্ষা করছি।"

বেয়ারা হাসল, "আপনারা তো ঘরের লোক। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন না!"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই মোটাসোটা যে মানুষটি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত বাড়ালেন, তার চুলে পাক ধরেছে, "অমল?"

"হ্যাঁ," হাত মেলাল অমল।

"আমি বাংলা ভাল বলতে পারি না। তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করবে বলে খুব খুশি। নাউ ইউ আর আ মেম্বার অফ দিস ফ্যামিলি। বোসো, বোসো," অমল উল্টোদিকের চেয়ারে বসতেই তিনি বললেন, "আই অ্যাম আহমেদ। ইন্টারন্যাশন্যাল ইমপোর্ট এ্যান্ড এক্সপোর্ট কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাকে দেখতে হয়।"

মিস্টার আহমেদ ড্রয়ার খুলে একটা খাম বের করে সামনে রাখলেন, "তোমার বাংলাদেশে যাওয়ার ভিসা হয়ে গিয়েছে। তুমি কাল সকাল ছ'টার মধ্যে মার্কুইস স্ট্রিট অ্যান্ড ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ক্রসিংয়ে গিয়ে খোঁজ করবে, কোথায় শ্যামলী ট্রান্সপোর্টের বাস পাওয়া যায়। ওই বাসে উঠলে ঢাকায় পৌঁছে যাবে সন্ধে নাগাদ। মাঝখানে বর্ডারে দু'দেশের ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস চেকিং হবে। নো প্রবলেম। শার্ট-প্যান্ট ছাড়া সঙ্গে কিছু নেবে না। পরশু ঢাকার এয়ারপোর্টে এসে কলকাতার ফ্লাইট ধরবে। ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ, সকাল দশটায় ছাড়ে। সঙ্গে একটা সুটকেস থাকবে, যেটা বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার সময় লাগেজে দিয়ে দেবে। আর হ্যাঁ, যাওয়ার সময় নিজের নর্মাল পোশাক পরে যাবে। কিন্তু ফেরার সময় তোমাকে একটা সাদা জ্যাকেট দেওয়া হবে, সেটা অবশ্যই পরবে।"

"ঢাকায় পৌঁছে কোথায় উঠব?"

"ওটা তোমার সমস্যা না। বাসের টার্মিনাসে তোমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে যে দাঁড়িয়ে থাকবে, সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে। তোমার প্লেন যখন দমদমে ল্যান্ড করবে, তখনই তুমি এই নম্বরে ফোন করে জানাবে। যদি নতুন কোনও ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার থাকে, তখনই তা জানিয়ে দেওয়া হবে। বাইরে বেরিয়ে এসে ড্রাইভারকে তোমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখলে তার গাড়িতে উঠে বসবে। ক্লিয়ার?"

"তা হলে আমি রাতে ঢাকায় পৌঁছব আর পরের সকালে ফিরে আসব?"

"তাই ঠিক করা আছে। কোনও অসুবিধে হলে বিকেলের অন্য ফ্লাইটে তোমার আসার ব্যবস্থা করে দেবে হাবিব।"

"হাবিব?"

"যে ওখানে তোমাকে রিসিভ করবে, তার নাম হাবিব।"

"কিছু মনে করবেন না, সুটকেসে কী থাকবে?"

"আমি জানি না। তোমারও জানতে চাওয়া উচিত নয়। এটাই চাকরির

শর্ত।"

"যদি কোনও বিপদে পড়ি..."

হাসলেন আহমেদ, "সাদা জ্যাকেট পরে থাকলে কোনও বিপদ হবে না।" খামটা এগিয়ে দিলেন তিনি, "এর মধ্যে তোমার পাসপোর্ট আর পাঁচশো বাংলাদেশি টাকা আছে। দরকার হবে না, তবু যদি প্রয়োজন হয়..." অমল খামটা নিতে ইতস্তত করছে দেখে আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন, "এনি প্রবলেম?"

"না," খামটা নিল অমল।

"তোমার প্রথম কাজ। গুড লাক। মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে যেও। বর্ডার পার হলে ওটা অবশ্য কাজে লাগবে না। কিন্তু ফিরে আসা মাত্র প্রয়োজন লাগবে। হ্যাভ এ নাইস জার্নি," হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক।

করমর্দন করে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেই চারটে ছেলে উঠে দাঁড়াল। একজন বলল, "আরে ইয়ার! তুম তো বহোত টাইম লে লিয়া?"

অমল কোনও কথা না বলে মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই ফোন করল সোহাগকে। রিং হচ্ছে। কিন্তু সোহাগের মা কথা বললেন, "কে?"

"মাসিমা, আমি অমল।"

"ও।"

"সোহাগ এখন কেমন আছে?"

"অনেকটাই ভাল। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। তাই ঘুমিয়ে আছে। ব্লিডিংটাও কালই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

"ও নতুন মোবাইল পেয়ে গিয়েছে দেখছি।"

"হ্যাঁ। আগের সিমকার্ডই ব্যবহার করছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ডাক্তার ফোনটা বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। ওর এখন কথা বলে উত্তেজিত হওয়া একদম ঠিক নয়। তোমার দরকার হলে আমার মোবাইলে ফোন করবে। তুমি আমার নম্বর জানো তো?"

"হ্যাঁ। কাল যে নম্বর থেকে কথা বলেছিলেন..."

"ওই নম্বরেই ফোন কোরো, রাখি?"

"মাসিমা, আমি আগামীকাল ভোরবেলা ঢাকায় যাচ্ছি, ফিরব পরশু দিন। সোহাগকে বলে দেবেন?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"দ্যাখো অমল, ও কোন কথা শুনে কী রিঅ্যাক্ট করে, তা তো জানি না। তবে যদি জিজ্ঞেস করে, তা হলে বলব, তুমি দু'দিনের জন্য বাইরে গিয়েছ। রাখছি।"

কীরকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগল অমলের! সে এখনও বুঝতে পারল না, তার চাকরির খবর শুনে সোহাগ প্রথমে খুব খুশি হলেও পরে কী ভেবে উত্তেজিত হল, যার জন্য তার নাক দিয়ে রক্ত বের হল!

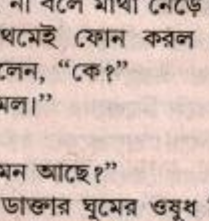

একটা শার্ট, গেঞ্জি, রাতের পায়জামা আর টুথব্রাশ-পেস্ট-সাবান ব্যাগে পুরে ভোর ছ'টায় অমল পৌঁছে গেল মার্কুইস স্টিটের মোড়ে। শ্যামলী পরিবহণের বাস দাঁড়িয়ে ছিল সামনেই। গিয়ে টিকিট দেখালে বলা হল, উঠে বসুন, একটু পরেই ছাড়বে। বাড়ি থেকে অমল এসেছিল ট্যাক্সিতে। এত ভোরে শেষ কবে পথে বেরিয়েছে মনে পড়ছিল না। আজ বুঝতে পারল, ভোরের কলকাতা সত্যি সুন্দর। মানুষ নেই, গাড়ির জঙ্গল নেই, শহরটাকে কীরকম অচেনা লাগছিল, বেশ আদুরে-আদুরে।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় বাস ছাড়ল। অমল শুনল, এই আরামদায়ক বাসটিকে ভলভো বলা হয়। এই সাত সকালেও এসি চলছে। কলকাতার মানুষ যদি প্রতিদিন এরকম বাসে যাতায়াত করতে পারত! পথে দু'জায়গায় বাস দাঁড়াল এবং সেখান থেকে যাত্রীরা উঠল, কোনও আসন খালি রইল না।

বাংলাদেশ এবং ঢাকা সম্পর্কে অনেক লেখা সে পড়েছে পুরনো বাংলা সাহিত্যে। পরিচিতদের অনেকের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। তাদের মুখে জেলাগুলোর নাম জেনেছে। যদিও তারা কেউই সেসব জায়গায় যাননি, কিন্তু ঠাকুরদা বা বাবার মুখে শুনে-শুনে নিজের বলে ভেবেছেন!

কলকাতা পেরিয়ে এসে নির্জন পথের পাশের দোকান থেকে ব্রেকফাস্ট তোলা হল। সঙ্গে জলের বোতল। তারপর সীমান্ত এল। দুই দেশের সব নিয়মকানুন মেনে আবার বাসে উঠল সকলে। দুপুর নাগাদ পদ্মার ঘাটে পৌঁছে সোজা স্টিমারে উঠে গেল। এই অভিজ্ঞতা কোনওদিন ছিল না অমলের। তার বেশ মজা লাগছিল! লঞ্চের তিন তলায় উঠে ক্যান্টিনের ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল খেল জল দেখতে-দেখতে। পদ্মার বুক জুড়ে বালির চর। স্টিমার যাচ্ছে অনেকটা জল ঘুরে। বাতাস বইছে খুব। খাওয়ার পর দাম মেটাতে গিয়ে দেখল পাঁচশো বাংলাদেশি টাকার দু'শো বেরিয়ে গেল!

বাস স্টিমার থেকে নেমে যখন চলতে শুরু করল, তখন আচমকা একটা আশঙ্কার কথা মনে এল ওর। ওই হাবিব নামের লোকটা যদি বাস টার্মিনাসে না আসে, তা হলে কী হবে? কোথায় যাবে সে? ঢাকায় তো কোনও চেনা মানুষ নেই। আর পকেটে আছে মাত্র তিনশো টাকা! পাশের সিটে যে বৃদ্ধ বসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে টুকটাক কথা হয়েছিল। শুনেছিল, তিনি যখনই ঢাকায় যান, তখনই রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্ট হাউসে ওঠেন। তাঁকেই সমস্যার কথা সে এখন বলল। ভদ্রলোক বললেন, "যদি কেউ না আসে, তা হলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। ওঁরা তো ভাড়া নেন না। যে যার মতো প্রণামী দিয়ে যায়।"

স্বস্তির শ্বাস ফেলল অমল। আজ রাতে সে অন্তত জলে পড়বে না!

ঢাকার চৌহদ্দি অনেক বড়। বিকেল হওয়ার আগে একবারেই মফস্সলের দোকানের সাইনবোর্ডে 'ঢাকা' নামটা দেখতে পেল অমল। ক্রমশ মনে হচ্ছিল, বর্ধমান অথবা কৃষ্ণনগরে ঢুকছে বাস। সন্ধে নামলে গতি এত কমে গেল যে, মনে হচ্ছিল, আজ রাতে আদৌ পৌঁছবে কিনা। পাশে বসা বৃদ্ধ বললেন, "ঢাকার এটাই সমস্যা। সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার হয় না। প্রাইভেট গাড়ি, বাস-রিকশা গায়ে-গায়ে লেপ্টে থাকে!"

শেষ পর্যন্ত রাত আটটা নাগাদ শ্যামলী পরিবহণের অফিসের সামনে পৌঁছল বাস। যাত্রীদের সঙ্গে নেমে এল অমল। মালবাহক এবং রিকশাওয়ালাদের হাঁকডাক চলছে। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?"

অমল কী বলবে, বুঝতে পারছিল না। বৃদ্ধের সঙ্গে চলে গেলে রাতের থাকার একটা ব্যবস্থা ঠিকই হবে, কিন্তু হাবিবের সঙ্গে দেখা হবে না। সেটা না হলে যে কাজের জন্য এসেছে, সেটা না করেই ফিরতে হবে। মাথা নাড়ল সে। ফিরবেই বা কী করে? তিনশো টাকায় কলকাতায় ফেরার টিকিট কখনওই পাওয়া যাবে না। অতএব তাকে হাবিবের প্রতীক্ষায় এখানেই থাকতে হবে। সে বৃদ্ধকে বলল, "না, থাক। আপনি যান।"

বৃদ্ধ চলে গেলেন।

অমল দেখল, মালপত্র নিয়ে কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। অফিসের ভিতরে বসার জায়গা আছে। কিন্তু কেউ তার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে নেই। সে চারপাশে তাকাল। এটাই কি ঢাকা শহর? দেখে মনে হচ্ছে, মফস্সলের ব্যস্ত রাস্তা, দোকানপাট!

রাত সাড়ে আটটার সময় একজন তরুণ এসে তার সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ইন্ডিয়া থেকে আসছেন?" পরনে জিন্স, টি শার্ট, পায়ে চটি। ছেলেটার গালে অল্প দাড়ি।

সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "কারও জন্য কি ওয়েট করতেছেন?"

"হ্যাঁ," ছেলেটির মতলব বোঝার চেষ্টা করল অমল।

"আপনার নামটা...?"

"কেন?"

"যদি নাম বলেন, তা হলে কারণ বলব।"

"অমল।"

সঙ্গে-সঙ্গে হাত কপালে ছোঁয়াল ছেলেটা, "চলেন। হাবিবভাই আপনাকে রিসিভ করতে বলছিল। কিন্তু এত জ্যাম, টাইম রাখে কার বাপের সাধ্য? আমি দিলু।"

"হাবিবভাই কোথায়?"

"উনি একটু বিজি। কিন্তু তার জন্য কোনও সমস্যা নাই।"

দিলু অমলকে নিয়ে একটা গাড়িতে উঠল। দেখেই বোঝা গেল, গাড়িটা বিদেশি। দিলু ড্রাইভারকে বলল, "গেস্ট হাউজে চলেন।"

পাশে বসে অমল জিজ্ঞেস করল, "এই জায়গাটার নাম কী?"

"মীরপুর।"

"ঢাকা শহরটা কি এইরকম?"

"না, না। দেখছেন না, রাস্তায় জ্যাম নাই। যখনই দেখবেন, গাড়ি এক জায়গায় তিন মিনিট বন্ধ, একটুও নড়ে না, তখনই বুঝবেন, আপনি শহরের ভিতর ঢুইক্যা পড়ছেন! এখন ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে, তারপর হয়তো অবস্থার চেঞ্জ দেখব। রাস্তায় কোনও সমস্যা হয় নাই তো?"

"না।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ওরা যে জায়গায় পৌঁছাল, তার নাম বাংলা মোটর। গেস্ট হাউজ গলির ভিতর। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে দিলু তাকে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা ছিমছাম। লাগোয়া বাথরুম। দিলু বলল, "গোসল করেন। নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। ডিনার দেবে একটু পরে।"

"হাবিবভাই?"

"উনি তো থানায় আছেন। যদি বেশি রাত্র হয়, তা হলে কাল সকালে আসবেন," দিলু বলল, "তা হলে আমি যাই? গুড নাইট।"

খেতে খারাপ লাগল না। যদিও তেল-পেঁয়াজের আধিক্য আছে। রাত বেশ হয়ে গেলে শুয়ে পড়ল অমল। বাংলায় কথাবার্তা বললেও সে এখন বিদেশে। দিলুর কাছে হাবিবের টেলিফোন নম্বরটা চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

ঘুম ভাঙল দরজায় কেউ শব্দ করায়। সাড়া দিয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে দরজা খুলতেই দেখল, একজন ভদ্রলোক দুটো হাত একত্রিত করে বললেন, "গুড মর্নিং, আপনার ঘুম ভাঙালাম। আমি হাবিব।"

"আসুন।"

"কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

"না।"

"আমারই যাওয়ার কথা ছিল আপনাকে রিসিভ করতে। কিন্তু আমাদের দুটো ছেলেকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে বলে থানায় অনেকটা সময় থাকতে হয়েছিল। আপনি স্নান করে রেডি থাকবেন, আমার ড্রাইভার আপনাকে সাড়ে ন'টা নাগাদ নিয়ে যাবে," হাবিব বললেন, "আপনার লাগেজ নিয়ে বেরবেন।"

"মিস্টার আহমেদ বলেছিলেন সকালেই ফ্লাইট..."

"না, সকালের ফ্লাইটে একটু অসুবিধে আছে। আপনি বিকেলের ফ্লাইটে যাবেন। আহমেদভাইকে জানিয়ে দিয়েছি। আপনি এখন চা-নাস্তা করুন," হাত বাড়ালেন হাবিব। করমর্দনের পর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। লোকটি বেশ স্মার্ট এবং ভদ্রতা জানেন। এই সকালেই সাফারি পরে বেরিয়েছেন।

ঠিক সাড়ে ন'টায় নীচে নেমে রিসেপশনিস্টের কাছে অমল জানতে পারল, গাড়ি এসে গিয়েছে। ড্রাইভার এবং গাড়ি গতকালের। ওঠামাত্র বড় রাস্তা এড়িয়ে গাড়ি গলিপথ দিয়ে চলা শুরু করল। কিছুক্ষণ দেখার পর অমল জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাই, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান কোথায় থাকতেন?"

"ধানমন্ডিতে। আমরা ওই দিকে যাচ্ছি না।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"গুলশন," ড্রাইভার বলল।

'গুলশন' শব্দটা সুন্দর। কলকাতায় এরকম নামের কোনও জায়গা নেই। যদিও অমলের বিশ্বাস, শব্দটি বাংলা নয়। কলকাতায় ইংরেজি নামের অঞ্চল আছে। যেমন, পার্ক সার্কাস। কিন্তু উর্দু শব্দের কোনও অঞ্চল নেই।

গুলশনে গাড়ি ঢোকার পর মন ভাল হয়ে গেল। সুন্দর-সুন্দর রাস্তা, দু'পাশের বাড়িগুলোও চমৎকার। তার একটির গেটে গাড়ি থামল। ড্রাইভার বলল, "আপনি পাঁচ তলায় উঠে যান। ওখানেই হাবিবসাহেব আছেন।"

বাড়িটিতে বেশ কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে। তাদের কাছে জানাতে হল, সে কোথায় যাচ্ছে। তাদের একজন টেলিফোনে জানতে চাইল, একজন এসেছে, যার নাম অমল। ওপাশের কথা শুনে লোকটা তাকে লিফ্ট দেখিয়ে দিল, "পাঁচতলা।"

"ফিফ্থ ফ্লোর?"

"না, ফোর্থ।"

উপরে উঠে দরজা খোলার পরে অমল দিলুকে দেখতে পেল, "আসেন।"

সামনের দরজা দিয়ে ঢোকার পর একটা বড় কাচের দরজা চোখে পড়ল। তার পাশে দিলু একটা প্লাস্টিক কার্ড ঢোকাতেই দরজা খুলে গেল। সামনেই দুটো সুন্দর সাজানো অফিস ঘর। তার একটিতে একজন সুন্দরী মহিলা কম্পিউটারে ব্যস্ত আছেন। দিলু বলল, "এই ঘরে বসেন। হাবিবভাই আপনাদের কাজে ব্যস্ত আছেন।"

সুন্দরী তাকালেন। হেসে বললেন, "সালাম আলেকুম। বসুন, প্লিজ।"

উল্টোদিকের গদিমোড়া চেয়ারে বসল সে।

"চা না কফি?" সুন্দরী জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি একটু আগে চা খেয়ে এসেছি," অমল বলল।

দিলু অমলের দিকে মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এর আগে ঢাকায় এসেছেন?"

"নাঃ, এই প্রথম।"

"তাই! কেমন লাগছে?"

"ভালই।"

"আপনি তো আজই চলে যাবেন। নইলে এই শহরে দেখার জিনিস অনেক আছে। নেক্সট টাইম এলে দেখবেন।"

"হ্যাঁ। সেরকমই ভেবেছি।"

"আপনি কি ঠান্ডা কিছু নেবেন?"

"না, অনেক ধন্যবাদ।"

"আমি কলকাতায় গিয়েছি দু'বার। ওখানকার একজন পরিচালক আমাকে ফিল্মের অফার দিয়েছিলেন।"

"বাঃ! আপনি রাজি হননি?"

"না!" মাথা নেড়ে হাসলেন সুন্দরী।

মিনিটকুড়ি পরে দিলু এসে অমলকে ভিতরের একটা ঘরে নিয়ে এল। সেখানে হাবিব একজনকে নির্দেশ দিচ্ছেন আর সেটা শুনে প্যাক করছে একজন। মোটা কাপড় দিয়ে সুটকেসের আকৃতির কিছুটা শক্ত করে মুড়ছে সে। তাকে দেখে হাবিবভাই বললেন, "১৯ কেজি ওজন হয়েছে। নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

ভিতরে কী আছে, তা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল অমল। কৌতূহল দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে তাকে। সে আশা করল, নিশ্চয়ই গাঁজা বা নেশার কিছু নেই!

হাবিব বলছেন, "এটা তো আপনার প্রথমবার? কোনও চিন্তা করবেন না। গাড়ির ডিকি থেকে ড্রাইভার আপনার ট্রলিতে ওটা তুলে দেবে। ঢুকেই এক্স রে করিয়ে সোজা কাউন্টারে চলে যাবেন। বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার সময় দেখবেন, ওরাই ওজন করে লাগেজ বেল্টে তুলে দিচ্ছে। কলকাতায় পৌঁছে একটু অপেক্ষা করতে হবে। পরের দিকে বেল্টে আসবে ওটা। লক্ষ করুন, হলদে কাগজের উপর লাল রঙের লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে, যাতে আপনি বুঝতে পারেন, ওটাই তুলতে হবে। তুলেই ট্রলিতে চাপিয়ে বেরিয়ে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন?"

মাথা নেড়ে অমল জানাল, সে বুঝতে পেরেছে।

পাশের আলমারি থেকে একটা নতুন সাদা জ্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরলেন, "দেখুন তো, এটা আপনার হয় কিনা? পরে দেখুন।"

জ্যাকেটটা অমল পরতেই হাবিব উচ্ছ্বসিত, "বাঃ! চমৎকার ফিট করেছে। ওটা একেবারে কলকাতায় গিয়ে খুলবেন।"

"এইটে পরা কি খুব দরকার?"

"হ্যাঁ। ওই জ্যাকেটের বুকে নীলচে গোল দাগ দেখলে এয়ারপোর্টের লোকজন বুঝবে, আপনি আমাদের লোক! আসুন।"

হাবিব তার অফিস ঘরে নিয়ে গেল অমলকে। বলল, "আপনার ভিসায় লেখ আছে, আপনি বাই এয়ার অথবা বেনাপোল দিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন," ড্রয়ার খুলে একটা লম্বাটে কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন তিনি। "এই হল আপনার টিকিট। আমার মনে হয়, এবার আপনার লাঞ্চ করে নেওয়া উচিত।"

"লাঞ্চ? আমি তো একটু আগে ব্রেকফাস্ট খেয়েছি।"

"কিন্তু আজকাল প্লেনে কোনও খাবার দেয় না। আপনাকে একটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। কলকাতায় পৌঁছানোর কথা আপনাদের টাইমে তিনটের সময়। তারপর লাঞ্চ করতে পারবেন?" হাবিব জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার অসুবিধে হবে না।"

"ওকে! তা হলে আর দেরি না করাই ভাল। রাস্তার যা অবস্থা!" হাবিব উঠে দাঁড়ালেন, "আহমেদভাই জানেন, আপনি কোন ফ্লাইটে পৌঁছবেন।"

মিনিটদশেক বাদে সেই গাড়ি, একই ড্রাইভার, পিছনের সিটে অমল একা। তাকে যেটা নিয়ে যেতে হচ্ছে, সেটা ডিকিতে। গাড়ি যাচ্ছে বেশ থেমে-থেমে, গড়িয়ে-গড়িয়ে। বিকট জ্যাম! শেষ পর্যন্ত এয়ারপোর্টে পৌঁছল, যখন তখন ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে। সে বেশ নার্ভাস হয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "আগে গেলে বোর্ডিং কার্ড দেবে তো?"

"আপনার কখন পৌঁছনোর কথা ছিল এখানে? ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

"একটায়।"

"তা হলে তো সমস্যা নাই। এখন তো একটাই বাজে।"

লোকটা বলে কী! নিজের মোবাইলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, বারোটা একত্রিশ। তারপরই খেয়াল হল, বাংলাদেশের সময় ভারত থেকে আধঘণ্টা এগিয়ে থাকে। নিজের বোকামির জন্য লজ্জা পেল অমল!

ড্রাইভার ট্রলি এনে লাগেজটাকে তার উপর তুলে দিল। ওটাকে ঠেলে এয়ারপোর্টের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় টিকিট দেখাতে হল। পাশেই এক্স রে মেশিন। একটা লোক লাগেজটা বেল্টের উপর তুলে দিলে সেটা স্বচ্ছন্দে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে এল! ওটার ওপর কাগজ সেঁটে দিলে আবার ট্রলিতে তুলে খানিকটা হেঁটে কাউন্টারগুলোর কাছে চলে এল অমল। এয়ারলাইন্সকে লাগেজ দিয়ে বোর্ডিং কার্ড পেতে একটুও অসুবিধে হল না তার।

অন্য যাত্রীদের আচরণ দেখল সে। বিদেশ তো দূরের কথা, এর আগে প্লেনে চেপে কোথাও যাওয়ার সুযোগ হয়নি! এখন বেশ ভাল লাগছে। সঙ্গে লাগেজ নেই বলে আরও হাল্কা মনে হচ্ছে! তার মনে হল, ওই ১৯ কেজির প্যাকেটটার মধ্যে নিশ্চয়ই অবৈধ কিছু নেই! থাকলে এক্স রে মেশিনে ধরা পড়ে যেত। সে অনর্থক ম্যাডামকে সন্দেহ করছিল। কিন্তু সাধারণ কিছু নিয়ে আসার জন্যে এত খরচ করে তাকে পাঠাল কেন?

ইমিগ্রেশন ডেস্কে পৌঁছলে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পাসপোর্ট বলছে, গতকাল বাই রোড এদেশে এসেছেন। পরের দিনেই প্লেনে ফিরে যাচ্ছেন কেন?"

"কলকাতা থেকে ফোন এসেছিল ফিরে যাওয়ার জন্য।"

"কোথায় ছিলেন আপনি?"

"এক বন্ধুর গেস্ট হাউজে," ঝটপট জবাব দিল সে।

ভদ্রলোক অমলকে আর একবার দেখে নিয়ে পাসপোর্টে ছাপ মেরে দিলেন।

প্লেন ছাড়ল দেরিতে। কলকাতায় পৌঁছল ভারতীয় সময় পৌনে চারটের সময়। রানওয়ে দিয়ে যখন প্লেন গড়াচ্ছে, তখনই মোবাইল অন করল অমল। মোবাইল চালু হওয়া মাত্র বেজে উঠল। 'হ্যালো' বলতেই মিস্টার আহমেদের গলা কানে এল, "অমল?"

"ইয়েস স্যার।"

"ইউ আর অলরাইট?"

"ইয়েস স্যার।"

"ওকে। আজ কোনও প্রবলেম নেই। লাগেজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসো। ড্রাইভারের নাম আবদুল। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে," লাইন কেটে গেল।

কলকাতায় ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্টের ছাপ দেখে হাসলেন, "গতকাল গিয়ে আজই ফিরে এলেন? মনে হচ্ছে, এটা প্রথমবার? তাই তো! আর কোনও ভিসার ছাপ নেই!" বলে স্ট্যাম্প মেরে দিলেন।

বেল্ট যখন চালু হল, তখন রকমারি ব্যাগ, সুটকেস ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। ট্রলি নিয়ে দাঁড়িয়ে অমলের মনে হল, তার যদি নিজের কোনও সুটকেস ওগুলোর মধ্যে থাকত, তা হলে চিনতেই পারত না! সব এক মনে হচ্ছে! অথচ বেল্টের দু'পাশে দাঁড়ানো যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে নিজের জিনিস তুলে নিচ্ছে! অনেকটা ধৈর্য ধরার পর প্যাকেটটা দেখতে পেল অমল। হাবিবভাই চিনিয়ে দিয়েছিল রং এঁকে, তাই ভুল হল না।

ট্রলিতে সেটা চাপিয়ে অন্য যাত্রীদের অনুসরণ করে বেরিয়ে যেতে গিয়ে সে দুটো গেট দেখতে পেল। একটা লাল, অন্যটা সবুজ। সবাই সবুজ গেট দিয়ে যাচ্ছে দেখে সে ওদিকে এগোল। একটা হলদে চিরকুট তাকে ইমিগ্রেশনের পরে দেওয়া হয়েছিল, একজন অফিসার হাত বাড়ালে সেটা দিয়ে দিল তাকে। অন্য যাত্রীদের দিতে দেখেছিল সে। হঠাৎ একজন জিজ্ঞেস করল, "ইল-লিগ্যাল কিছু ওই লাগেজে নেই তো?"

সে দ্রুত মাথা নেড়ে 'না' বলতে ইশারা করা হল বেরিয়ে যেতে। ট্রলি ঠেলে বাইরে বের হতেই ছোটখাটো ভিড় চোখে পড়ল। অনেকেই নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটায় নিজের নাম দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা জিজ্ঞেস করল "আপনার নাম?"

"অমল।"

"আমি আবদুল, দিন।"

ট্রলিটাকে নিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে পার্কিং লটে পৌঁছে মালটা গাড়ির ডিকিতে তুলে দিয়ে পিছনের দরজা খুলে দিল আবদুল। এর কিছুক্ষণ পরে গাড়িটা যখন রাজারহাট দিয়ে বাইপাসের দিকে ছুটে যাচ্ছিল, তখন অমলের মনে হল, এতক্ষণে তার সমস্ত অস্বস্তি দূর হয়ে গেল!

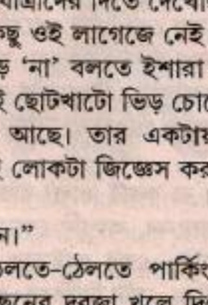

গাড়িটা যখন খিদিরপুরে পৌঁছল, তখন বিকেল ঘন হয়ে গিয়েছে। একজন সিকিউরিটির লোক নেমে এসে লাগেজের দায়িত্ব নিল। বলল, "স্যার আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

উপরে উঠল অমল। আজ বাইরের ঘরে কেউ নেই। মিস্টার আহমেদের ঘরেও তিনি একাই। অমলকে দেখে হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, "কনগ্র্যাচুলেশনস!"

কিছু না করা সত্ত্বেও অভিনন্দন পেয়ে লজ্জিত হল অমল।

মিস্টার আহমেদ বললেন, "তুমি একশোতে একশো পেয়ে গিয়েছ!"

"কীরকম?"

"কাল রাতে গেস্ট হাউজেই ছিলে। অনেকেই রাতে ফূর্তি করতে বেরয়। ড্রিঙ্ক করে। তুমি করোনি। ঠিক সময় হাবিবের অফিসে গিয়েছ। ওর সুন্দরী অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে সুযোগ পেয়েও তোষামোদ করার চেষ্টা করোনি। ক্যারিয়ারদের সবসময় নির্লিপ্ত থাকতে হয়। এই ব্যাপারে তোমাকে আমি কিছু না বললেও তুমি তাই থেকেছ বলে ম্যাডাম খুব খুশি হয়েছেন।" আহমেদ কথাগুলো বলার পর অমল পকেট থেকে তিনশো বাংলাদেশি টাকা বের করে তাঁর সামনে রাখল।

"এগুলো কী?"

"পাঁচশোর মধ্যে দু'শো খরচ হয়েছিল কাল দুপুরে খাওয়ার জন্য।"

"মাই গড! বাঃ! খুব ভাল। তোমার নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট ব্যাঙ্ককে। ওঃ হো, তুমি কি এই ট্রিপের টাকা এখনই নিয়ে নিতে চাও?" আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনার যাতে সুবিধে হয় তাই..." বাক্য শেষ করল না অমল।

"ঠিক আছে। তুমি আজ পুরোটাই নিয়ে যাও। এর পরে অন্যদের ক্ষেত্রে যা করি, তাই করব। ফিফটি পার্সেন্ট ফিরে এলেই পাবে, বাকিটা একসঙ্গে মাসের শেষে নেবে। তোমার ব্যাঙ্কক সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে?" আহমেদ জানতে চাইলেন।

"না।"

"দু'দিন সময় পাচ্ছ। এর মধ্যে ব্যাঙ্কক সম্পর্কে ইন ডিটেল্‌স জেনে নাও। অনেক বই আছে, দাঁড়াও," আহমেদ চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন ওপাশের একটা ছোট আলমারির সামনে। একটা ছোট বই বের করে এনে সামনে রাখলেন, "এটা পড়ে ফেলো। কিছুটা জানতে পারবে। ঢাকায় তোমাকে রিসিভ করতে লোক এসেছিল, থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল, এয়ারপোর্টে পৌঁছেও দিয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্ককে তোমাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। বুঝতে পারলে?"

"চেষ্টা করব।"

"গুড!" ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে গুনে আহমেদ অমলকে দিলেন, "তিন আছে। তোমার মোবাইল যেন সবসময় অন থাকে।"

টাকাগুলো তুলে পকেটে রাখল অমল।

"আর একটা কথা শোনো। তোমার মতো অনেক ছেলে এখন ক্যারিয়ারের চাকরি করছে। আমাদের কোম্পানির বাইরেও বেশ কয়েকটা অন্য দলের ক্যারিয়ার হয়ে তারা বিদেশে যাওয়া-আসা করে। ওরা নিজেদের মধ্যে একটা দল তৈরি করে নেয়। ফলে সাহস বেড়ে যায় এবং নিজেদের কন্ট্রোল করতে পারে না। ম্যাডাম চান, তুমি এরকম দল এড়িয়ে যাবে। সেই ক্যারিয়ার যদি আমাদের কোম্পানির লোক হয়, তবু তাকে এড়িয়ে যাবে। ওকে, বাই!" হাত মিলিয়ে ঘাড় নাড়লেন আহমেদ।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াল অমল। এখন সন্ধে হব-হব। বিদেশের ভাল গেস্ট হাউজে এক রাত কাটিয়ে, প্লেনে ফিরে এসে তার লাভ হয়েছে তিন হাজার টাকা। ভাবা যায়? গোটা মাস সিকিউরিটির চাকরি করেও চারের বেশি পাওয়া যেত না! তা ছাড়া এই যে সে ঢাকা থেকে ঘুরে এল, কোনও অসৎ কাজ তো করতে হয়নি। তাকে দিয়ে যদি এরা কোনও অবৈধ জিনিস আনিয়ে থাকে, তা হলে তো এয়ারপোর্টের এক্স রে মেশিনেই ধরা পড়ে যেত! অতএব, এই কাজ করার জন্য তার মনে কোনও খারাপ ভাবনা আসছে না। উল্টে কাজটা পেয়ে খুব ভাল লাগছে।

"কী রে শালা! চুপচাপ কী ভাবছিস?"

ঘাড় ঘুরিয়ে রবীনকে দেখতে পেল অমল। জিন্‌সের উপর দারুণ একটা টি-শার্ট পরে এগিয়ে আসছে।

"আজই ঢাকা থেকে ফিরলি?" কাছে এসে জিজ্ঞেস করল রবীন।

"হ্যাঁ। কী করে জানলি?"

"জানি। কিন্তু তুই কি মাল পেয়েছিস?"

"হ্যাঁ। মিস্টার আহমেদ তিন হাজার টাকা দিয়েছেন!"

রবীন বলল, "ফাটাফাটি! আমি নিশ্চয়ই তোর কাছ থেকে একটা খাওয়া পেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। কী খাবি, কবে খাবি, বল?"

"দ্যাখ, ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি ভাবি না। কবে না, আজই। পকেটে তোর মাল আছে, খাইয়ে দে!" রবীন বলল।

"আমি এখনও বাড়ি ফিরিনি। এক কাজ করি, মাকে ফোন করে দিচ্ছি,

তুই রাতে খাবি। বাড়িতেই চল," অমল বলল।

"ফোট! চচ্চড়ি আর মাছের ঝোল খেতে যাওয়ার পাবলিক ভেবেছিস আমাকে? অটো ক্লাবে চল, তোর খরচ কম হবে," রবীন এগিয়ে গিয়ে ওর বাইক চালু করল, "উঠে পড়।"

প্রায় ঝড়ের গতিতে ছুটল রবীনের মোটরবাইক, অমল চেঁচাল, "হেলমেট ছাড়া চালাচ্ছিস, পুলিশ ঠিক ধরবে!"

"ধরলে তোকে ধরবে!" চেঁচিয়ে বলল রবীন।

"আমাকে? কেন?" গলা চড়াল অমল।

"ওরা ভিতুদেরই ধরে!"

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পেট্রল পাম্পে বাইক ঢোকার পর অমলের মনে হল, ফেরার সময় সে ওই বাইকে উঠবে না।

ঢোকার মুখে কার্ড দেখাল রবীন। অমলের জন্য গেস্ট চার্জ দিল সে। অমল জিজ্ঞেস করল, "তুই এখানকার মেম্বার কবে হয়েছিস?"

"বছরখানেক। বিদেশ থেকে পরিচিত কেউ এলে খাওয়াতে হয়। এত সস্তা আর কোথায় পাব?" সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে বলল রবীন। সোজা তিনতলার ছাদে উঠে এল তারা। রবীন বলল, "চল, এসি রুমে বসি। বাইরে গ্যাঞ্জাম বেশি।"

বসামাত্র ওয়েটার এসে দাঁড়াল। রবীন বলল, "চিকেন পকোড়া আর চিলি ফিশ, জলদি। তুই কী নিবি?"

হকচকিয়ে গেল অমল, "মানে?"

"আরে ব্যাটা, হুইস্কি না রাম, না ভদকা?"

"না, না। আমি ওসব কিছু খাব না!" অমল বলল।

"আমার জন্য একটা হুইস্কি আর ওর জন্য এক গ্লাস দুধ!"

"দুধ পাওয়া যাবে না স্যার!" ওয়েটার বলল।

অমল প্রতিবাদ করল, "আমি দুধ খাই না রবীন!"

"তা হলে অন্তত বিয়ার খা। সন্ধেটা নষ্ট করে দিস না। বিদেশে লোকে জলের বদলে বিয়ার খায়। নেশা হয় না। একা-একা মদ খেতে খুব খারাপ লাগে। একটু কম্পানি দে?" হাসল রবীন।

চুপ করে গেল অমল। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, বিয়ার খেলে হুইস্কির মতো নেশা হয় না। কিন্তু মুখে গন্ধটা কতক্ষণ থাকে? কিন্তু প্রশ্নটা রবীনকে করতে সঙ্কোচ হল।

রবীন বলল, "তোর ঢাকা ট্রিপ ভাল হয়েছে শুনলাম?"

"আমি তো বুঝতেই পারলাম না। গেলাম, চলে এলাম।"

"যত কম বুঝবি, তত ভাল!"

"আচ্ছা রবীন, কোম্পানি আমার পিছনে এত খরচ করল, টাকাও দিল, এতে ওদের কী লাভ হল? ধরা যাক, ওখান থেকে কোনও জিনিস আমি নিয়ে এসেছি, যা বিক্রি করলে অনেক লাভ হবে। তা হলে সেটা নিশ্চয়ই আইনের চোখে বৈধ নয়। কিন্তু তা হলে তো এক্স রে মেশিনে ধরা পড়ে যেত। তাই না?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"মেশিনে যাতে ধরা না পড়ে, তার ব্যবস্থাও আছে!" রবীন বলল।

"কীরকম?"

"ধর, এদেশে তৈরি হয় না অথচ ডিমান্ড আছে, এমন মোবাইল ফোন নিয়ে আসছিস। ধরা পড়লে ওটা সরকার বাজেয়াপ্ত করবে, তোর জেল হবে। তুই লাগেজ প্যাক করার সময় মোবাইল ফোনগুলো একটা বাক্সে ভরে তার চারপাশে ভাল করে কার্বন শিট মুড়ে দিলি। তারপর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম ব্যাগে ভরে, কয়েকটা বই দিয়ে লাগেজটা ভরিয়ে দিলি। চাইলে একটা মদের বোতলও রাখতে পারিস। এক্স রে মেশিনে সব দেখা যাবে। কিন্তু কার্বনের পিছনে কী আছে, তা বোঝা যাবে না। তা ছাড়া..." হাসল রবীন, "যদি সকলে চোখ বন্ধ করে থাকে, তাহলে ভয় কীসের?"

"তুই কী নিয়ে এলি?" অমল জিজ্ঞেস করল।

এইসময় বিয়ার আর হুইস্কি এসে গেল। রবীন গ্লাসে বিয়ার ঢেলে অমলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমি জানি না। আমাকে বলা হয়েছিল, গার্মেন্টস আনতে হবে। প্যাঁটরার মধ্যে কী আছে, তার খোঁজ না করে ভেবেছি, গার্মেন্টস নিয়ে এসেছি। চিয়ার্স!"

অল্প তেতো স্বাদ। মা বলে তেতো স্বাদের খাবার খেলে শরীর ভাল হয়। এখন সতর্ক হয়ে চুমুক দিতে লাগল অমল। যখনই বুঝবে শরীরে সমস্যা হচ্ছে, অমনই পান করা বন্ধ করে দেবে।

"হাই রবীন!" নারীকণ্ঠের উচ্ছ্বাস ভেসে এল।

রবীনের দেখাদেখি পিছন ফিরে তাকাল অমল। তাদেরই বয়সি একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে, যার পরনে জিন্‌স আর টপ। হাতে ঢাউস ব্যাগ, চুল কাঁধ পর্যন্ত ফাঁপানো। মেয়েটির পিছনে একজন খুব রুগ্ন চেহারার প্রৌঢ় আসছেন।

রবীন উঠে দাঁড়াল, "হাই অদ্রিজা! কেমন আছ?"

"আমি তো খারাপ থাকি না। তোমাদের টেবিলে বসতে পারি?"

"শিওর," রবীন চেয়ার দেখিয়ে দিল।

অমল অন্য প্রান্তে সরে গেলে প্রৌঢ় তার পাশে বসলেন। অদ্রিজা রবীনের পাশে। রবীন জিজ্ঞেস করল, "এই ক্লাবে তুমি?"

"ফর আ চেঞ্জ। যেতে-যেতে ভাবলাম, ঢুকে পড়ি। ওহো, আলাপ করিয়ে দিই। মিস্টার গুপ্ত, আমার নতুন বিজনেস পার্টনার। জয়, এর নাম রবীন, ওর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে আলাপ। ওঁকে তো..." থেমে গেল অদ্রিজা।

"অমল, আমার বন্ধু," রবীন বলতেই অমল নমস্কার করল।

অদ্রিজা হেসে হাত বাড়াল। অমল বাধ্য হল হাত স্পর্শ করতে।

রবীন বলল, "অমল এই একটু আগে ঢাকা থেকে এল।"

"তাই?" অদ্রিজা বলল, "আমি এত জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু ঢাকায় যাইনি।"

সব খাবার এল। রবীন জিজ্ঞেস করল, "কী নেবে তোমরা?"

অদ্রিজা প্রৌঢ়ের দিকে তাকাল, "তুমি তো ফ্রেশ লাইম সোডা ছাড়া কিছু খাবে না!"

প্রৌঢ় বললেন, "অন্য কিছু আমার সহ্য হয় না।"

অদ্রিজা দাঁড়িয়ে থাকা ওয়েটারকে বলল, "একটা লার্জ হুইস্কি আর ফ্রেশ লাইম সোডা, সল্টেড।"

অমল শুনছিল। অদ্রিজা কয়েকদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছে। ওখানে সে আর মিস্টার গুপ্ত একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে। কাপড়ের ব্যবসা করে ওরা। একটা বুটিক খুলেছেন মিস্টার গুপ্ত। মদ্যপান করতে-করতে গল্প চলল রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। একটি বিয়ার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আর অর্ডার দেয়নি অমল। রবীনও জোর করেনি।

অদ্রিজা বলেছিল, "এ কী, আপনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন?"

জবাবে মৃদু হেসেছিল অমল। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছিল, মানুষ অনেক কথা শুধু বলার জন্য বলে, কোনও উদ্দেশ্য থাকে না।

রাত সাড়ে ন'টায় অমল বলল, "রবীন, এবার আমি উঠব।"

রবীন মাথা নাড়ল, "আমিও। কাল আমাকে চায়না যেতে হবে।"

ততক্ষণে পাঁচ পেগ খাওয়া হয়ে গিয়েছে অদ্রিজার। বলল, "ওকে, চলো।"

বিল এল। রবীনের আপত্তি সত্ত্বেও মিস্টার গুপ্তাই পুরোটা দিয়ে দিলেন। রবীন জিজ্ঞেস করল, "অদ্রিজা, তুমি এখন কোথায় যাবে?"

"ঘুম পাচ্ছে, বাড়ি যাব," অদ্রিজা বলল।

"কোথায় যেন? সল্ট লেকে?"

"নো স্যার। আমার পূর্বপুরুষ বাগবাজারে যে বাড়ি করে গিয়েছেন, আজ সেখানেই যাব। কাল আমার মায়ের জন্মদিন।" অদ্রিজা বলল।

"বাঃ! অমলও শ্যামবাজারের দিকে থাকে। ওকে লিফ্‌ট দাও।"

"উইথ প্লেজার।"

অমল মাথা নাড়ল, "না, না। আমি চলে যাব।"

অদ্রিজা ঢুলু-ঢুলু চোখে তাকাল, "আমার সঙ্গে যেতে আপনার দেখছি খুব আপত্তি আছে? এই প্রথম কাউকে দেখলাম, যে আমার কোম্পানি পছন্দ করে না! জয়, নোট করে রাখো।"

প্রৌঢ়ের নাম যাই হোক, অদ্রিজা তখন থেকে 'জয়' বলে ডাকছে। ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই অমল বলল, "এ আপনি কী বলছেন! আপনার অসুবিধে হতে পারে ভেবেই..."

অমলকে থামিয়ে দিল অদ্রিজা, "ইট্‌স অল রাইট। চলুন।"

নীচে এসে রবীন বিদায় নিয়ে তার বাইকে উঠে চলে গেল। শীততাপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির পিছনের আসনে ওরা উঠলে অমল ড্রাইভারের পাশে বসল।

ড্রাইভার বলল, "সিট বেল্ট বেঁধে নিন।"

ওটাকে খুঁজে বের করে ঠিকঠাক লাগাতে সময় নিল অমল।

ততক্ষণে গাড়ি রাতের কলকাতায় চমৎকার ছুটে ঢুকে পড়েছে সদর স্ট্রিটে। একটা মাঝারি মাপের হোটেলের সামনে গাড়ি থামতে প্রৌঢ় বললেন, "আমার হোটেল এসে গিয়েছে। সি ইউ টুমরো। গুড নাইট।"

অদ্রিজা বলল, "গুড নাইট!" তার মাথা সিটের উপর হেলানো।

প্রৌঢ় নেমে যেতে গাড়ি এগোল চৌরঙ্গির দিকে। যেন হঠাৎ খেয়াল হল অদ্রিজার। বলল, "শিবু, গাড়ি সাইড করো।"

ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়াতেই অদ্রিজা বলল, "আপনি পিছনে চলে আসুন অমল। যেভাবে বসে আছি, সেভাবে গল্প করা যায় না।"

বাঁধনমুক্ত হয়ে পিছনের দরজা খুলে সন্তর্পণে বসল অমল।

অদ্রিজা জিজ্ঞেস করল, "ঢাকায় কি কোনও কাজে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। একটা ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কোম্পানির কাজে।"

"ওঃ," হঠাৎ ব্যাগ খুলে কার্ড বের করে অমলকে দিল অদ্রিজা। "পৃথিবীর যে দেশেই যাই, মোবাইল নম্বর একই থাকে। শুধু তার আগে কান্ট্রি কোড বসাতে হয়। এখন কলকাতা-সিঙ্গাপুর করব মাসকয়েক। যদি ইচ্ছে হয় কোম্পানি চেঞ্জ করার, তা হলে এই নম্বরে ফোন করলেই হবে।"

"অনেক ধন্যবাদ," কার্ডটা পকেটে রাখল অমল।

"শোনো, আমি বেশিক্ষণ 'আপনি' বলতে পারি না। আমাকেও 'তুমি' বলবে," হাসল অদ্রিজা, "তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। কেন, জানো?"

"না," গলা শুকিয়ে গেল অমলের।

"সাধারণত যারা এই লাইনে আসে, তারা অশিক্ষিত হয়, লাউড হয়। যাদের পেটে কিছু বিদ্যে আছে, তাদের চালচলন, কথাবার্তায় অতিরিক্ত চালাকি ফুটে ওঠে। তোমাকে এতক্ষণ লক্ষ করলাম। তুমি ক্যাবলা নও, কিন্তু বেশ ধীর, স্থির। এটাই দরকার," অদ্রিজা অমলের হাতে হাত দিল।

গ্রে স্ট্রিট পেরিয়ে গেল গাড়ি।

অমল বলল, "সামনের পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়ালে সুবিধে হয়।"

সঙ্গে সঙ্গে অদ্রিজা বলল, "শিবু।"

গাড়ি থামল। অমল বলল, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

"আঃ। আবার 'আপনি'?"

"ওকে, 'তোমাকে'।"

সে দরজা খুলে নামতেই ড্রাইভার বলল, "আপনার ব্যাগটা..."

সামনের সিট থেকে ব্যাগটা তুলে অমলের হাতে দিল লোকটা।

গাড়ি চলে গেলে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াল অমল। অদ্রিজাকে তার খুব রহস্যময় মনে হচ্ছিল! অতগুলো পেগ খেয়েও তেমন নেশা হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল না। বরং ওর চেয়ে অনেক কম খাওয়া রবীনের গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, এখনও কি মুখে বিয়ারের গন্ধ থেকে গিয়েছে? একটা পান খেলে কীরকম হয়!

মোড়ের পানের দোকান থেকে একটা জর্দা ছাড়া মিঠে পান কিনে মুখে পুরতে না-পুরতেই কানে এল পকেটে রিং হচ্ছে। তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা বের করে দেখল নাম্বারটা সোহাগের। অবাক হয়ে যন্ত্রটা চালু করল অমল, "হ্যালো?"

"ফিরে এলে কখন?" সোহাগের গলা।

"একটু আগে। তুমি কেমন আছ?"

"আছি। বাবা নতুন ফোন এনে দিয়েছেন। তাতে পুরনো সিমকার্ড ভরে নিয়েছি। ডাক্তার বলেছেন দু'দিন পরে নর্মাল হয়ে যাব। ঘুমতে যাওয়ার আগে ভাবলাম, ফোন করে দেখি তুমি ফিরে এসেছ কিনা!" সোহাগ বলল।

"তুমি ভাল আছ শুনে খুব ভাল লাগছে সোহাগ।"

"জানি। আচ্ছা, ঢাকা শহরটা কেমন?"

"ভাল। কিন্তু রাস্তায় খুব জ্যাম-জট হয়।"

"বঙ্গবন্ধুর বাড়িটা দেখেছ?"

"না, সময় পাইনি।"

"ও মা! শহিদ মিনারে নিশ্চয়ই গিয়েছ, যেখানে ২১ ফেব্রুয়ারির ভোরে সকলে শ্রদ্ধা জানাতে যায়? ওই যে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের..."

"না সোহাগ, কোথাও যেতে পারিনি। একদম সময় ছিল না।"

"যাঃ!" সোহাগ জিজ্ঞেস করল, "কী এমন কাজ যে, সময় পেলে না?"

"আমি তো গিয়েছি বাসে চেপে। গোটা দিন চলে গিয়েছিল। রাতটুকু থেকে সকালে কাজ করে দুপুরে ফিরে এসেছি," অমল পরিষ্কার বলল।

"দুপুরে ফিরেছ?" গলার স্বর বদলে গেল সোহাগের।

সঙ্গে-সঙ্গে অমল বুঝতে পারল, সে প্রথমে বলেছিল একটু আগে ফিরেছে। মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে কথাটা! তাড়াতাড়ি আর একটা মিথ্যে তৈরি করল সে, "দুপুরে ঢাকা এয়ারপোর্টে ঢুকে গিয়েছিলাম। প্লেন ছাড়ার কথা ছিল সেসময়। কিন্তু কী এক গোলমালের জন্যে প্লেন ছাড়ল সন্ধ্যার পর। অতক্ষণ বাধ্য হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল এয়ারপোর্টের মধ্যে। কোথাও যেতে পারিনি।"

"তাই বলো! বাড়িতে ঢুকে গিয়েছ?"

"এই এখন বাড়ির সামনে।"

"তা হলে যাও, সারাদিন অনেক কষ্ট হয়েছে তোমার। রাখছি," সোহাগ যখন রেখে দিল।

মনখারাপ হয়ে গেল অমলের। খামোকা সে আজ মিথ্যে বলল সোহাগকে। এত দিন চেষ্টা করেছে, আর যাকেই যাই বলুক, সোহাগকে কখনওই মিথ্যে বলেনি। কিন্তু আজ যা যা ঘটনা ঘটে গেল, তা কি সোহাগকে বলা যেত? তারপরই মনে হল, কেন বলা যেত না? সোহাগ তো তার প্রেমিকা নয়, স্ত্রী নয়! তাই যদি বলত, রবীনের সঙ্গে ক্লাবে গিয়ে যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ার খেয়েছে, এত রাতে পাঁচ পেগ মদ খাওয়া অদ্রিজার গাড়িতে বাড়ি ফিরেছে, তা হলে মিথ্যে বলা হত না। তাতে যদি সোহাগের খারাপ লাগত, তা হলে হয়তো বলত, "এগুলো খারাপ। আর কোরো না।" তার বেশি তো কিছু হত না! তা হলে খামোকা ওর কাছে লুকোল কেন?

অমলকে দেখে মায়ের মুখে হাসি ফুটল, "এই ফিরলি?"

"না, বিকেলে ফিরেছি। অফিসে যেতে হয়েছিল," আবার অর্ধ সত্য বলল অমল।

দাদা এগিয়ে এল, "কীরকম এক্সপিরিয়েন্স হল?"

"ভাল!" নিজের ঘরের দিকে এগোল অমল।

"তুই যে মাসের মাঝখানে জয়েন করলি, স্যালারি কীভাবে দেবে?"

"জিজ্ঞেস করিনি।"

"আরে! এসব কথা আগে থেকেই বলে নিতে হয়। টিউশনি করা আর চাকরি এক ব্যাপার নয়। একটু প্র্যাকটিক্যাল না হলে ঠকবি!" দাদা বলল।

মা বলল, "থাক। এইমাত্র ফিরল, ওকে বিশ্রাম নিতে দে।"

ঘরে ঢোকামাত্র বউদির গলা কানে এল, "আমি আগে থেকে এই চেয়ারে বসে আছি। তুমি ফিরেছ দেখে আর তর সইছে না।"

ব্যাগটা নীচে রাখল অমল, "তর সইছে না কেন?"

"বিদেশে গিয়েছিলে, আমার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু এনেছ!"

বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল অমল।

"জামদানি কি একটাই এনেছ? তা হলে কাউকে বলার দরকার নেই।"

"কেন?"

"অনেক দাবিদার জুটে যাবে।"

"কিন্তু এই বাড়িতে তুমি ছাড়া আর কেউ তো..."

"ওঃ, তোমার মাথায় কিছুই ঢোকে না। শাশুড়িমা খুশি হবেন? তাঁর মেয়েকে জামদানি না দিয়ে আমাকে দিলে?" বউদি চোখ ঘোরাল।

মাথা নাড়ল অমল, "না বউদি, এবার একদম সময় পাইনি। পরের বার মনে রাখব।"

উঠে দাঁড়াল বউদি। ঠোঁট ফুলিয়ে যাওয়ার আগে বলল, "তুমি একটা যাচ্ছেতাই!"

খাওয়াদাওয়ার পর মাকে নিজের ঘরে ডেকে আনল অমল। ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে দেড় হাজার তুলে দিল মায়ের হাতে, "এটা রাখো।"

"কী ব্যাপার?" মা অবাক।

"কালকের কাজের জন্য কোম্পানি অ্যাডভান্স দিয়েছিল, তার অর্ধেকটা তোমাকে দিলাম," অমল বলল।

"না, না। এভাবে দিস না। মাস শেষে ১০ হাজার দাদাকে দিয়ে দিস, তা হলেই হবে," মা বলল।

"শোনো, আমার চাকরিটা হল, কাজ করলে টাকা পাব, না করলে কিছু পাওয়া যাবে না! ধরো, মাসে চারবার ওরা আমাকে কাজে পাঠাল, তার জন্যে দেবে ১২ হাজার টাকা। তখন কী করে দাদাকে ১০ হাজার দেব?"

"এই যে শুনলাম, তোর মাইনে ৩০ হাজার?"

"ঠিকই শুনেছ। কথা হয়েছে, ওরা আমাকে ১০ বার কাজ দেবে। তা হলে মাসের শেষে ৩০ হাজার পাব। কিন্তু যদি কোনও কারণে কাজ কমে যায়, সেকথা ভেবেই বলছি। তখন দাদা ভাববে, আমি হয়তো ইচ্ছে করেই কম টাকা দিচ্ছি! তাই আগে থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া ভাল। আমি কাজ করে ফিরলেই তুমি দাদাকে এক হাজার টাকা দিয়ে দেবে।" অমল বলল।

"কিন্তু তুই তো দেড় হাজার দিলি!"

"বাকি পাঁচশো তুমি রেখে দিও।"

"অত টাকা রেখে আমি কী করব?"

"যা খুশি। ইচ্ছেমতো খরচ কোরো।"

অমল লক্ষ করল, মায়ের মুখে খুশির আভা ফুটেই মিলিয়ে গেল।

সে জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"না রে, এত টাকা আমাকে দিস না। তোর বাবা থাকতেও কিছু দরকার হলে চেয়ে নিতে হত। তোর দাদা চাকরি পেলেও আমাকে কোনও হাতখরচ দেয়নি। আজ যদি এই টাকা হাতে পেয়ে খরচ করা শুরু করি, তা হলে সকলের চোখে পড়বে। বুঝতেই পারবে, তুই আমাকে টাকা দিচ্ছিস," মা বিষণ্ণ গলায় কথাগুলো বলল।

"বুঝলে বুঝবে। তুমি কান দিও না।"

"তোর দাদা ফ্ল্যাট কিনবে। প্রতি মাসে টাকা শোধ করতে হবে ওকে। হিমশিম খেয়ে যাবে। তখন যদি দ্যাখে, তাকে টাকা না দিয়ে আমি ইচ্ছেমতো খরচ করছি, তা হলে নিশ্চয়ই ওর ভাল লাগবে না। এটা তুই রেখে দে," পাঁচশো টাকা ফেরত দিতে চাইল মা।

মাথা নাড়ল অমল। তারপর পাঁচটা একশো টাকার নোট থেকে দুটো তুলে নিয়ে বলল, "আর কথা বাড়িও না। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

সকাল দশটায় সিকিউরিটির অফিসে পৌঁছে অমল ম্যানেজারের কাছে তার ইউনিফর্মগুলো জমা দিয়ে জানাল, তার পক্ষে আর ওই চাকরি করা সম্ভব নয়।

তাকে দেখে তিনদিন না বলে কামাই করার জন্য ভর্ৎসনা করবেন, দরকার বুঝলে ছটাই করবেন, বলে তৈরি হচ্ছিলেন ম্যানেজার, অমলের কথা শুনে হকচকিয়ে গেলেন, "তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কিন্তু কেন?"

"আমার পোষাচ্ছে না।"

"ও! ভাবছ চাপ দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে নেবে?"

"না স্যার। আমি আর একটা চাকরি পেয়েছি। ভাল মাইনে।"

"ভাল মাইনে? কত?"

"থাক স্যার। আপনি আমাকে রিলিজ করে দিন।"

"এভাবে হুট করে চাইলেই তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না? দেখতে হবে তোমার কাছে কোম্পানির কোনও পাওনা আছে কিনা।" ম্যানেজার বললেন।

"আপনি জানেন, কোনও পাওনা নেই।"

"কিন্তু এভাবে হুট করে চাকরি ছেড়ে দিলে আমি লোক পাব কোথায়? তাই একমাসের নোটিস দাও," ম্যানেজার বললেন।

"কিন্তু স্যার, যখন চাকরিটা দিয়েছিলেন, তখন একটা কাগজে সই করিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল, কোনও কারণ না দেখিয়ে যে-কোনও দিন আমাকে স্যাক করতে পারে কোম্পানি। আপনি আমাকে স্যাক করুন!" অমল বলল।

"বুঝতেই পারছি, তুমি বড় গাছে নৌকো বেঁধেছ!" শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার রিলিজ অর্ডার দিয়ে দিলেন। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলো তো, নতুন চাকরিতে মাইনে দেবে কত?"

কাগজটা পকেটে পুরতে-পুরতে অমল বলল, "৩০ হাজার!"

সঙ্গে-সঙ্গে চোয়াল ঝুলে গেল ম্যানেজারের! চোখ স্থির। অমল বেরিয়ে এল চুপচাপ। খুব হাল্কা লাগছিল তার।

গোটা দিন কোনও ফোন এল না। অস্বস্তি হচ্ছিল খুব। একটা দিন কামাই হওয়া মানে অনেক লস। দুপুরে অদ্রিজার দেওয়া কার্ড দেখল সে। ও ব্যবসা করে সিঙ্গাপুরে। একটা বাঙালি মেয়ে এই বয়সে এতটা সাফল্য পেয়েছে, সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু অত মদ খায় কেন অদ্রিজা? ও কি বিবাহিতা নয়? মিস্টার গুপ্তার যা বয়স, তাতে ওর সঙ্গে ব্যবসার বাইরে অন্য সম্পর্ক হওয়া কি সম্ভব? রবীনের কাছে এর জবাব পাওয়া যেত। কিন্তু রবীন তো আজ চিনে চলে গিয়েছে। খুব রোজগার করছে রবীন। বোঝাই যাচ্ছে, ম্যাডাম ওকে পছন্দ করেন।

বিকেলে সোহাগকে ফোন করল অমল, "কেমন আছ?"

"খুব ভাল। তুমি?"

"আছি।"

"গলায় এমন হতাশা কেন?"

"কাল তোমাকে সত্যি কথা বলিনি।"

"কোন কথা?"

"তুমি জিজ্ঞেস করায় বলেছিলাম, এখন ফিরেছি ঢাকা থেকে। কিন্তু আমি ফিরেছিলাম বিকেলে।"

হাসল সোহাগ, "বিকেলকে রাত করলে কেন?"

"জানি না। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল!"

"তাই? অবশ্য অন্ধের কী বা দিন, কী বা রাত!"

"মানে?"

"তুমি বিকেলে ফেরো বা রাতে, তা আমার কাছে একই কথা!"

"না। আমার কাছে এক নয়। এয়ারপোর্ট থেকে অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানকার কাজ শেষ করতেই যে আমাকে চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিল সে খেতে চাইল। পরে খাওয়াব বলে এড়াতে না পারায় গিয়েছিলাম ক্লাবে। সেখানে ওর চাপে বাধ্য হয়েছিলাম একটা বিয়ার খেতে। ওখানেই ওর পরিচিত একজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হল, যিনি সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করেন। তারপর বাড়ি ফিরে আসার সময় তোমাকে ফোন করেছি," একটানা কথাগুলো বলার পর অমল শুনল সোহাগ আলতো শব্দে হাসল। শব্দটা কানে বাজতেই অমল জিজ্ঞেস করল, "হাসলে কেন?"

"তুমি এত ব্যাখ্যা করছ বলে মজা লাগল!" সোহাগ বলল।

"মজা?"

"তুমি কলকাতায় ফিরে এসেছ, এটুকু জানতে পারলেই আমার ভাল লাগবে। কখন ফিরেছ, ফিরে কোথায় কোথায় গিয়েছ, কাদের সঙ্গে কথা বলেছ, তা জানার তো কোনও প্রয়োজন নেই। বাড়ির বাইরে একমাত্র তোমার সঙ্গেই আমি কথা বলি। তুমি কলকাতায় থাকলে কথা বলা যায়। তুমি এত ব্যাখ্যা করতে গেলে কেন?" সোহাগ বেশ সুন্দর করে কথাগুলো বলল।

কিন্তু কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র বুকের ভিতর অস্বস্তি তিরতিরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। অমল শ্বাস নিল। তার কি সোহাগের কথা শুনে কষ্ট হচ্ছে?

সোহাগ বলল, "তুমি কি আজ আসবে?"

"আজ?" সঙ্গে-সঙ্গে মন ভাল হয়ে গেল অমলের, "নিশ্চয়ই, যাচ্ছি।"

"এসো।"

মোবাইল পকেটে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। পাশের বাড়িতে সিডিতে গান বাজছে, 'তুমি হেসে উঠলেই সূর্য লজ্জা পায়...' মাথা নাড়ল অমল। তার জীবনে যদি এমন কেউ থেকে থাকে, তা হলে সে সোহাগ। কিন্তু সোহাগ তার প্রেমিকা নয়। যার সামনের রাস্তা প্রতিদিন ছোট হয়ে আসছে, সে কখনওই সম্পর্ক তৈরি করতে চায় না। তা হলে কি প্রেম একটি দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের অঙ্গীকার? এসব সত্ত্বেও তার সোহাগের পাশে বসে কথা বলতে ভাল লাগে। অন্তত টেলিফোনেও দু'-তিনটে কথা মনে স্বস্তি ছড়ায়।

বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিল অমল, হঠাৎ খেয়াল হল, রোজই তো বাসে চেপে সোহাগদের বাড়িতে যায়, আজ ট্যাক্সিতে গেলে কেমন হয়? পঞ্চাশজনের একজন হয়ে মাথা নিচু করে না গিয়ে একা আরামসে যাওয়া যাবে! তার পকেটে আজ যে টাকা আছে, তাতে বহুবার সোহাগদের বাড়ি ট্যাক্সিতে ঘুরে আসা সম্ভব! সে হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সি থামাল। উঠে বসতে না-বসতেই মোবাইল বাজতে থাকল। ওটাকে অন করতেই শুনল, "অমল?"

"হ্যাঁ।"

"আহমেদ বলছি।"

"বলুন স্যার।"

"তুমি এখনই অফিসে চলে এসো। ওকে?" লাইন কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

"কোথায় যাবেন ভাই?" বৃদ্ধ ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

ঠোঁট কামড়াল অমল। তারপর বলল, "খিদিরপুর।"

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে সে বাইরে তাকাল। ফুটপাথে মানুষ হাঁটছে, রাস্তায় ছুটন্ত গাড়ি। কলকাতার এই চেহারা এক মুহূর্তে বদলে যাবে যদি কেউ বোমা ছোড়ে! একটা আওয়াজেই এই রাস্তা শ্মশানের চেহারা নেবে! আহমেদের টেলিফোনটা ওই বোমা ছোড়ার কাজটা করল। যাওয়ার কথা ছিল সোহাগদের বাড়িতে, যাচ্ছে খিদিরপুরে! অথচ এই ফোনটার আশায় সে সারাদিন অপেক্ষা করেছিল। ডাক আসা মানে নতুন কাজে বাইরে যেতে হবে। গেলেই টাকা! কিন্তু ফোনটা তো দুপুরেও করতে পারতেন মিস্টার আহমেদ? অথবা সন্ধের পরে? ট্যাক্সি প্রায়ই আটকে যাচ্ছিল জ্যামের জন্য। মোবাইলে সময় দেখল অমল। যদি মিস্টার আহমেদের কাছে বেশি সময় না লাগে, তা হলে আবার ট্যাক্সিতেই সোহাগদের বাড়িতে চলে যাবে। সোহাগকে ফোন করতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল অমল। এখন না করে মিস্টার আহমেদের কাছ থেকে বেরিয়ে ফোন করাই ঠিক হবে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া মেটাতে গিয়ে মেজাজটা চটকে গেল অমলের। একশো বাইশ টাকা গুনে দিতে হল। বাসে এলে বারো টাকায় হয়ে যেত! মাথা নাড়ল সে। মা যে টাকাটা নেয়নি, সেই টাকা থেকেই ভাড়াটা দিয়েছে ভাবলে একটু স্বস্তি হবে। পাহারাদাররা উপরে উঠতে বাধা দিল না। দোতলার লোকটি বলল, "ভিতরে যান, সাহেব আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।"

ভিতরে যাওয়ামাত্র মিস্টার আহমেদ তাকে বসতে বললেন। মুখের দিকে

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাঙ্কক, আই মিন তাইল্যান্ড সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে?"

"না স্যার।"

"মালয়েশিয়া?"

"আমি তো কখনও ভারতের বাইরে যাইনি।"

"না গেলেও আমরা বন্ধুদের মুখ থেকে অথবা বই পড়ে অন্য দেশ সম্পর্কে জেনে থাকি। আমি কখনও ফ্রান্সে যাইনি। কিন্তু প্যারিস সম্পর্কে যা জেনেছি, তার উপর ভিত্তি করে বলতে পারব, কীভাবে দ্য গল এয়ারপোর্ট থেকে আইফেল টাওয়ারে পৌঁছব।" মিস্টার আহমেদ হাসলেন।

"আমি জেনে নেব স্যার।"

"গুড। তার জন্য তোমাকে বেশিদিন সময় দিতে পারব না," মিস্টার আহমেদ কথাগুলো বলতেই তাঁর মোবাইল জানান দিল। মিস্টার আহমেদ সেটা ডান কানে চেপে নিচু গলায় বললেন, "ইয়েস ম্যাডাম...হি ইজ় হিয়ার... ওকে," ফোন রেখে দিয়ে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, "লেট্স গো।"

একটু অবাক হয়ে মিস্টার আহমেদকে অনুসরণ করল অমল। ওই বাড়ি থেকে নেমে পাশের বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন মিস্টার আহমেদ। অমল লক্ষ করল, সদর দরজাটা ভদ্রলোক এড়িয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাডামের দরজায় নক করলেন মিস্টার আহমেদ। তারপর ঘুরে তাকিয়ে অমলকে বললেন, "এসো।"

ঘরের কোণে একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাডাম ফাইল দেখছিলেন। এখন চমৎকার দেখাচ্ছে তাঁকে। হাঁটুর নীচে পৌঁছনো রঙিন স্কার্ট এবং সাদার ওপর নীল ফুলতোলা জামা, চোখে বড় কাচের চশমা। মাথা নেড়ে বললেন, "জাস্ট আ মিনিট।"

মিস্টার আহমেদ চেয়ারে বসে ইশারা করলে অমল বসল। ম্যাডাম ফিরে এলেন তাঁর চেয়ারে। হাতে ফাইল।

"গুড ইভনিং। কেমন আছ অমল?" ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন।

"ভাল।"

"তোমার ঢাকা ট্রিপ যে আমাদের পছন্দ হয়েছে, তা মিস্টার আহমেদের কাছে শুনেছ? পছন্দ হওয়ার কারণ, যা বলা হয়েছিল, তুমি তাই ফলো করেছ। কিন্তু কখন-কখনও এটা তোমার নেগেটিভ দিক হয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা মিস্টার আহমেদ তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন," ম্যাডাম হাসলেন।

মিস্টার আহমেদ বললেন, "কিন্তু অমল বলছে, তাইল্যান্ড অথবা মালয়েশিয়া সম্পর্কে ওর কোনও তথ্য জানা নেই।"

"খুব স্বাভাবিক। এত দিন ইন্টারেস্ট ছিল না, তাই জানতে চায়নি।"

"তা হলে নতুন রিক্রুটদের যেভাবে পুরনোদের সঙ্গে পাঠানো হয়, দলের সঙ্গে থেকে সব জেনে নিতে পারে, ওকেও কি তাই পাঠাব?"

সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে 'না' বললেন ম্যাডাম, "আমি চাই না, আমাদের অন্য ক্যারিয়ারদের সঙ্গে মিশে অমল কাজ করুক। ওরা কাজটা করে ঠিকই, কিন্তু বেসিক্যালি সবাই অশিক্ষিত, আনকালচার্ড। আমাদের দরকার, তাই ব্যক্তিত্বহীন ছেলেগুলোকে কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু অমলকে আমি ওদের থেকে আলাদা দেখতে চাই, যেটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।"

"ওকে ম্যাডাম।"

"আমি ভাবছি, প্রথমে ওকে টুরিস্ট হিসেবে ব্যাঙ্ককে পাঠাব। ভাল করে শহরটা চিনে আসুক। অমল, তুমি ইন্টারনেটে গিয়ে ব্যাঙ্কক সম্পর্কে যা তথ্য পাও, তার প্রিন্ট আউট বের করে পড়ে ফ্যালো। ডু ইট ইমিডিয়েটলি। পরশু তুমি ব্যাঙ্ককে যাবে। পরের দিন শহরটা দেখে তার পরের দিন ফিরে আসবে। ঠিক আছে? ওর ভিসাটা কালই করিয়ে দিন মিস্টার আহমেদ।"

মিস্টার আহমেদ তাকালেন, "পাসপোর্ট সঙ্গে আছে?"

"না।"

"কাল সকাল সাড়ে ন'টায় আমার অফিসে পৌঁছে দিও।"

"ইয়েস স্যার।"

"আপনি কি ওকে আর কিছু বলবেন?" মিস্টার আহমেদ ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' বললেন। তারপর সোজা হয়ে বসলেন, "অমল, তোমার যখন ইচ্ছে হয় না, তখন কারও অনুরোধে ড্রিঙ্ক করতে রাজি হলে কেন?"

চমকে গেল অমল।

ম্যাডাম বললেন, "যে যাই বলুক, বিয়ার খেলেও নেশা হয়। যদি সঙ্গ এড়াতে না পার, তা হলে যাবে, গিয়ে জলজিরা বা ওই জাতীয় কিছু নেবে। তুমি যদি পান করতে পছন্দ করতে, তা হলে তোমাকে একথা বলতাম না।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম!" কোনওরকমে বলল অমল।

"আর একটা কথা, সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ লিফ্ট দিতে চাইলে কখনও তার গাড়িতে উঠবে না। কখন বিপদে জড়িয়ে যাবে, তা নিজেই জানবে না।"

ম্যাডামের উপদেশ শুনে হৃৎপিণ্ডটা যেন একলাফে অমলের গলার কাছে উঠে এল।

ম্যাডাম বললেন, "তুমি এখন যেতে পার অমল।"

ফুটপাথে নেমে আসার সময় অমলের মনে হচ্ছিল, তার পায়ে কোনও জোর নেই। সে নিঃসন্দেহ হল, রবীনই ম্যাডামকে এসব কথা বলেছে। অথচ সে পান করবে না বলে আপত্তি জানানো সত্ত্বেও রবীন তাকে প্রায় বাধ্য করেছিল বিয়ার নিতে। অদ্রিজাকে লিফ্ট দিতে অনুরোধ করেছিল রবীনই। অথচ কথাগুলো ম্যাডামকে জানিয়ে দিয়েছে নিজেকে না জড়িয়ে! একথা সত্যি, রবীন তাকে এই চাকরি পেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কথা বলে ম্যাডামের কান ভারী কেন করল?

কিন্তু রবীন তো আজ ভোরবেলা চিনে চলে গিয়েছে। ম্যাডামকে জানাল কখন? কাল রাতে? অত রাতে? অমল ভেবে পাচ্ছিল না, রবীন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ম্যাডাম এত কথা জানতে পারেন! তা হলে অদ্রিজার কথাও জানেন। ভদ্রমহিলা একবারও অদ্রিজার নাম করেননি। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, খবরটা তাঁর কাছে আছে। এই সঙ্গে অমলের মনে হল, ম্যাডামের উপদেশগুলো মেনে চলা উচিত। খুব সঠিক কথা বলেছেন তিনি। তবে রবীন ফিরে এলে ওর সঙ্গে কথা বলবে সে। কথাগুলো শুনে ম্যাডাম তো রেগে যেতে পারতেন। তা হলে তার চাকরিটা খতম হয়ে যেত! রবীন তাকে কেন বিপদে ফেলে দিয়েছিল?

এখন সন্ধে নেমে গিয়েছে। কলকাতার রাস্তায় আলো জ্বলছে। প্রথম ট্রামে, তারপর বাসে চেপে সোহাগদের বাড়িতে চলে এল অমল।

দরজা খুললেন সোহাগের মা, "ও, তুমি!"

অমলের মনে হল, ভদ্রমহিলা তাকে দেখে একটুও খুশি হলেন না।

"কেমন আছেন সবাই?" অমল জিজ্ঞেস করল দরজায় দাঁড়িয়ে।

"মেয়ের এই অবস্থায় আমরা ভাল থাকব ভাবছ কী করে?"

"না, মানে..."

"দ্যাখো অমল, তুমি ছেলেবেলা থেকে এই বাড়িতে আসছ। শোভনের বন্ধু বলে তোমাকে আমরা বাড়ির লোক বলেই ভেবেছি। আমরা জানি, বেশিদিন সোহাগ আমাদের কাছে থাকবে না। কিন্তু যত দিন থাকছে, আমরা চাইছি ওর যেন কষ্ট না হয়," সোহাগের মা বললেন।

"আমাকে এসব বলছেন কেন?"

"কারণ, সেদিন তোমার সঙ্গে কথা বলার পর ওর ব্লিডিং হয়েছিল। আবার রক্ত দিতে হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, ও যেন আর উত্তেজিত না হয়!"

"আমি সতর্ক থাকব।"

ভদ্রমহিলা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "এসো।"

সোহাগ আধ শোওয়া হয়ে বই পড়ছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল, "দেরি হল? জ্যাম ছিল?"

অমল 'না' বলতে গিয়ে হ্যাঁ বলল মাথা নেড়ে। চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, "কী বই পড়ছ?"

"গীতবিতান। পড়তে খুব ভাল লাগে। পড়ি আর মনে-মনে গাই।"

গীতবিতান রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্কলন। যারা গান গায়, তাদের ওই বইটির দরকার হয়, এটুকু অমল জানে। কিন্তু ওই বই কেউ কবিতা পড়ার মতো যে পড়ে, তা জানা ছিল না তার। গল্পের বই পড়ার অভ্যেস থাকলেও কবিতার বই কবে পড়েছে, মনে নেই। আর গীতবিতান সে কখনওই পড়েনি। সে হাসল।

সোহাগ বলল, "রবীন্দ্রনাথ মারা গিয়েছিলেন ১৯৪১ সালে। বাবার জন্মের চার বছর আগে। বাবার ঠাকুরদাও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। তাঁর ছবি দেখেছি। গ্রামের মানুষদের চেহারা যেমন হয়। পড়াশোনা খুব কম, চাষবাস নিয়ে থাকতেন। তা হলে রবীন্দ্রনাথ কী করে এসব লেখা লিখতে পারলেন?"

"তাঁর প্রতিভা অসাধারণ ছিল, তাই!" অমল আর কিছু ভেবে পেল না।

বই-এর পাতা উল্টালো সোহাগ, "এখানে একটা লাইন আছে, আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মানে বলতে পারল না। দেখি, তুমি পার কিনা!"

"কী লাইন?"

"আমরা জানি শব্দ 'বাজে'। তাই তো? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাজে আলো, বাজে রে ভাই...' আলো কী করে 'বাজে'?" হাসল সোহাগ।

গানটা অমল কয়েকবার শুনেছে। সে পরের লাইনটার কথা ভাবল। কোনও অর্থই যখন পরিষ্কার হচ্ছে না, সোহাগ তার দিকে তাকিয়ে আছে, সে মরিয়া হয়ে বলল, "যখন মন ভাল হয়ে যায়, তখন বুকের ভিতর আলো এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, তা ঢেউয়ের মতো শব্দ তোলে! এটা বাইরে থেকে শোনা যায় না, আলো যার বুকে বাজে, সে-ই অনুভব করে।"

কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল সোহাগ। তারপর হাসল। বলল, "তুমি যে এরকম করে ভাবতে পার, আমি জানতাম না!" সে বই পাশে রেখে বলল, "এবার বলো, তোমার নতুন চাকরি কীরকম? ঢাকায় গিয়ে কী কাজ করতে হল?"

শোনামাত্র সতর্ক হল অমল। ঘরে ঢোকার আগেও মাসিমা বলে দিয়েছেন, সোহাগ যেন তার কোনও কথায় উত্তেজিত না হয়। অতএব, সব সত্যি ওকে বলা যাবে না। অমল বলল, "খুব ভাল। যেসব জিনিস এদেশে আমার কোম্পানি আমদানি করে নিয়ে আসবে, সেগুলো ওখানকার ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখে নিতে হয়। লিস্ট মিলিয়ে দেখতে হয় ঠিক প্যাক করছে কিনা, এসব।"

"ঢাকা গিয়ে একদিনেই সব হয়ে গেল?" সোহাগ জিজ্ঞেস করল।

"ওরা রেডি করে রেখেছিল। তা ছাড়া এবার পরিমাণ কম ছিল।"

"কী জিনিস নিয়ে এলে এবার?"

"কাপড়। জামদানি, টাঙ্গাইল..." অমল হাসল।

"বাঃ, চাকরিটা তো বেশ ভাল। আবার কবে বাইরে যাবে?"

"এখনও কিছু বলেনি অফিস।"

হঠাৎ হাসল সোহাগ, মুখে দুষ্টুমির ইঙ্গিত, বলল, "মহিলার বয়স কত? তোমার বয়সি?"

"কোন মহিলা?" অবাক হল অমল।

"বা রে! যে তোমাকে কাল বাড়িতে পৌঁছে দিল!" সোহাগ বলল।

সতর্ক হল অমল! সত্যি কথা বলা বোধ হয় উচিত হবে না। অদ্রিজা তাকে বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার ব্যবহার কখনওই শোভনসীমা অতিক্রম করেনি। একথা শুনতে যদি সোহাগের ভাল না লাগে, যদি ভাবে, সে তার কাছে সাজানো কথা বলছে, তা হলে আবার উত্তেজিত হবে, আবার ব্লিডিং হবে ওর। সে দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, "অনেক বড়। বহু দিন ধরে বিদেশে ব্যবসা করছে। সিঁথিতে সিঁদুরও ছিল। তা ছাড়া সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি সম্পর্কে ওর ভাশুর।"

অমল লক্ষ করল, শোনামাত্র সোহাগের মুখের চেহারা শান্ত হয়ে গেল।

সোহাগের মা এলেন চায়ের কাপ নিয়ে। অমলের হাতে সেটা তুলে দিয়ে বললেন, "তুই সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে বই পড়ে যাচ্ছিস, ঘরের মধ্যেই একটু যদি হাঁটাহাঁটি করিস, তা হলে খিদে হবে। ডাক্তার তো তাই বলেছে।"

"একা-একা এই ঘরে হেঁটে বেড়াব, কী বোকা-বোকা ব্যাপার," হাসল সোহাগ, "আচ্ছা, মেয়েরা তাদের চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের বিয়ে করে, তা হলে উল্টোটা হয় না কেন?"

"এ আবার কী কথা?" থমকে গেলেন সোহাগের মা।

"আচ্ছা, তুমি বাবার চেয়ে আট বছরের ছোট, যদি আট বছরের বড় হতে তাহলে কি বাবাকে বিয়ে করতে?" সোহাগ মায়ের দিকে তাকাল।

"কী সব অদ্ভুত কথা!" ওর মা যেন পালিয়ে বাঁচলেন।

অমল বলল, "সম্ভবত শারীরিক কারণেই ওটা হয়ে থাকে। দু'জন সমবয়সি মানুষ বৃদ্ধ হলে পুরুষের কাজ করার যে ক্ষমতা থাকে, তা নারীর থাকে না। অবশ্য তুমি যা বললে, তা যে একেবারেই হচ্ছে না, তা তো নয়। শুনেছি, মহাত্মা গাঁধীর স্ত্রী বয়সে বড় ছিলেন।"

"তুমি যখন বিয়ে করবে, তখন কি চাইবে মেয়েটি বয়সে ছোট হোক?"

"দূর! খামোকা বিয়ে করতে যাব কেন?"

"অ্যাঁ? ও মা, কেন?"

"কত বই আছে, যা একজীবনে পড়া হবে কিনা সন্দেহ। বউ আনলে বইকে বিদায় দিতে হবে।" হাসল অমল।

হঠাৎ সোহাগ বলল, "তোমার ফোন না এলে কীরকম ফাঁকা লাগে।"

"যখন সেরকম লাগবে, তখনই আমাকে ফোন করবে।"

"কী করে পাব? তুমি তো এখন থেকে প্রায়ই বিদেশে যাবে।"

"সে তো এক-দু'দিনের জন্য। তা ছাড়া বিদেশেও ফোন নেওয়া যায়। তার নম্বর তোমাকে দেব," চায়ের কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল অমল।

"যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। রাত হয়েছে। খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।"

মাথা নেড়ে হাসল সোহাগ।

বাইরে বেরিয়ে এসে অমল অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। না, আর কখনও এমন কথা বলা যাবে না, যা সোহাগকে উত্তেজিত করবে! সে ভেবেছিল, এই একটাই জায়গা, যেখানে সব সত্যি বলা যায়। কিন্তু প্রতিবার রক্তপাত মানে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। একটা সত্যির চেয়ে দশটা মিথ্যের পাপ অনেক শ্রেয়, যদি তা সোহাগের আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারে!

তাইল্যান্ডের কারেন্সির নাম হল ভাট। একটা তাই ভাটের বিনিময়ে ভারতের এক টাকা তিয়াত্তর পয়সা পাওয়া যায়। অর্থাৎ একশো তিয়াত্তর টাকার সমান হল ওদের একশো ভাট।

মিস্টার আহমেদ অমলকে সব বুঝিয়ে দিলেন। যদিও অমলের এভাবে শুধু দেখতে যাওয়াটা তিনি যে পছন্দ করছেন না, তা বোঝাবার ধরনেই অমল বুঝতে পারছিল। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, "এই ট্রিপটা কোম্পানি তোমার পিছনে খরচ করছে, কিন্তু কোনও রিটার্ন পাচ্ছে না! তোমার লাভ হচ্ছে, একটা নতুন দেশ দেখতে পারবে। আমার তো মনে হয় না, তারপর তুমি কোনও পারিশ্রমিক আশা করতে পার। কারণ, কোম্পানির জন্য তো কোনও পরিশ্রমই তুমি করছ না। অবশ্য ম্যাডাম যদি দিতে চান, তা হলে কিছু বলার নেই। এই নাও তোমার টিকিট। রাত এগারোটার আগেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে। পাসপোর্টে ভিসার ছাপ মারা আছে। এর পরের বার যাওয়ার আগে যাতে আবার ভিসার জন্য আবেদন না করতে হয়, তাই মাল্টিপল ভিসা নেওয়া হয়েছে। কাল ভোরে ব্যাঙ্ককে পৌঁছে ভাল করে শহরটাকে দেখবে। আবার রাত দশটার আগে এয়ারপোর্টে এসে কলকাতার ফ্লাইট ধরবে। সুতরাং, হোটেলে ওঠার দরকার নেই। এই খামে দু' হাজার ভাট আছে। এত লাগার কথা নয়। ফিরে এসে হিসেব দেবে।"

"আমি কি ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে যাব?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"ম্যাডাম আজ সকালে মুম্বই গিয়েছেন।"

"ব্যাঙ্ককে গিয়ে কি কারও সঙ্গে দেখা করব?"

প্রশ্নটা শুনে একটু ভাবলেন মিস্টার আহমেদ। তার ড্রয়ার থেকে একটা কার্ড বের করে পিছনে কিছু লিখে দিলেন, "এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে কার্ডটা দেখিও। ভবিষ্যতে এঁর কাছেই তোমাকে যেতে হতে পারে। ওয়েল, ইয়ং ম্যান, তুমি দেখছি খুবই ভাগ্যবান! ভালভাবে ঘুরে এসে পরশু সকাল দশটায় রিপোর্ট করবে এখানে।"

অমল উঠে দাঁড়াল, "আচ্ছা, যদি কোনও কারণে ফেরার প্লেন ক্যানসেল হয়?"

মিস্টার আহমেদ গম্ভীর হলেন, "অমল, এই ব্যবসায় এসে দ্বিতীয়বার ওই 'যদি' বা 'অথবা' শব্দ ব্যবহার করবে না। যে-কোনও অবস্থার সঙ্গে যদি মানিয়ে চলতে না পার, তা হলে বাড়িতেই বসে থাকো। ম্যাডাম যদি একথা শোনেন, তা হলে তোমার সম্পর্কে তাঁর ভাল ধারণা চটকে যাবে। বাই!"

বাড়ি ফিরে এল অমল। গোটা দিন খিদিরপুর এবং তাই সরকারের দূতাবাসে কেটেছে। পেটে শুধু দু'টো টোস্ট আর এক কাপ চা পড়েছিল। এখন বিকেল। তবু পেটভরে ভাত খেয়ে মাকে বলল, "আজ রাতের ফ্লাইটে বাইরে যাচ্ছি। তুমি আমাকে ঠিক ন'টার সময় ডেকে দেবে।"

বিছানায় শোওয়ামাত্র বউদি চলে এল ঘরে, "তোমার কী মজা! ঘন-ঘন প্লেনে উঠছ। আবার ঢাকায় যাচ্ছ? এবার কিন্তু জামদানি চাই-ই!"

অমল কোনও কথা না বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

এগারোটার অনেক আগেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল অমল। ঢাকায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ইমিগ্রেশনের ফর্ম ভর্তি করে দেখল, এয়ারপোর্ট গমগম করছে। তার চোখ বড় হল কয়েকটা ছেলের আচরণ দেখে। ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে ওদের বয়স। বেশিরভাগই হিন্দিতে কথা বললেও বোঝাই যাচ্ছে ওরা বাঙালি। বেশ উদ্ধত এবং উঁচু গলায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। এমনকী, ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়িয়েও ওরা একইরকম। অনেকগুলো পকেট ওদের জিনসে, পায়ে ময়লা পুরনো স্যান্ডেল, টি-শার্ট। এসব ছেলেদের আগে সিনেমা হলের সস্তা টিকিটের লাইনে মারপিট করতে দেখা যেত। অমলের মাথায় ঢুকছিল না, এরা কী করে প্লেনের টিকিট কেটে বিদেশে যাচ্ছে? তার হাতে যাওয়া-আসার যে ই-টিকিট আছে, তাতে ব্যাঙ্ককের ফেয়ার তো দশ হাজারের কাছাকাছি! সে লক্ষ করল, তার মতোই ওরাও খালি হাতে যাচ্ছে। যদিও তার হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগে দাঁত মাজার ব্রাশ এবং দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আছে, ওদের হাতে তা-ও নেই!

চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সিকিউরিটির কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে

গিয়ে দেখল, এক ভদ্রমহিলা কাঁদছেন। তিনি কয়েকটা দামি পারফিউম কিনেছিলেন ডিউটি ফ্রি শপ থেকে, যেগুলো তাঁকে নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। যে-কোনও তরল পদার্থ নিয়ে প্লেনে ওঠা নিষেধ। অমল একটু এগিয়ে যাত্রীদের অপেক্ষা করার জায়গায় বসতেই দেখল, সেই চার জনের দলটা টিভির সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে চিৎকার করছে! সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

প্লেনে উঠে সিটবেল্ট বাঁধার সময় ওই ছেলেগুলোর চিৎকার কানে আসছিল। এয়ার হোস্টেসদের মুখ থমথমে! অমলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একজন এয়ার হোস্টেস ওই ছেলেদের একজনকে সিটবেল্ট বেঁধে নিতে বললে সে হেসে হিন্দিতে বলল, "কী হবে না বাঁধলে? মরে যাব?"

"সিট বেল্ট বাঁধা অত্যন্ত জরুরি। আপনাকে বেঁধে ফেলতে হবে!" এয়ার হোস্টেসের গলা উপরে উঠল।

"যদি না বাঁধি?" ছেলেটি বলামাত্রই তার সঙ্গীরা ওকে অনুরোধ করল ঝামেলা না করে বেঁধে ফেলতে। ছেলেটি সিটবেল্ট বাঁধলে এয়ার হোস্টেস ফিরে গেল তার জায়গায়। অমলের পাশে বসা ভদ্রলোক নিচুগলায় বললেন, "এই ছেলেগুলোর জন্য রাতের ফ্লাইটে যাওয়া বন্ধ করতে হবে।"

"এরা কি রোজ রাতের ফ্লাইটে ব্যাঙ্কক যায়?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"রোজই যায়। তবে হয়তো এক ব্যাচ নয়। অশিক্ষিত, বেয়াদব এই ক্যারিয়ারগুলো। সরকার সব জেনেও কোনও স্টেপ নেয় না।"

"ক্যারিয়ার?"

"হ্যাঁ। ওরা অবৈধ জিনিস বিদেশ থেকে ক্যারি করে আনে।"

"ধরা পড়ে না?"

"কে ধরবে? ঠিক সময়মতো আপনি যদি ঘুমিয়ে পড়েন, তা হলে দেখবেন কী করে?"

অমল দ্রুত ঢোঁক গিলল। ভদ্রলোকের কথায় ওই ছেলেগুলো সম্পর্কে ঘৃণা স্পষ্ট। তাকেও তো ভবিষ্যতে একই কাজ করতে হবে। ঢাকা থেকে সে যা এনেছে, তার মধ্যেও নিশ্চয়ই অবৈধ কিছু ছিল। কিন্তু ম্যাডাম তাকে কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি। কেন? মিস্টার আহমেদ তো সেই সহজ পথটাই ভেবেছিলেন। অমল কল্পনা করল, সে ওইরকম একটি দলের সঙ্গে ক্যারিয়ার হয়ে বাইরে যাচ্ছে। মাথা নাড়ল সে। অসম্ভব ব্যাপার। এইসময় প্লেন গড়াতে লাগল। নিয়ম মেনে ঘোষণা করা হচ্ছে। আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। প্লেন যেই রানওয়ে ছেড়ে আকাশে উড়ল, অমনই পিছন থেকে তীব্র সিটির শব্দ ভেসে এল! সঙ্গে-সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। একটি পুরুষকণ্ঠ গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, 'যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন অন্য যাত্রীদের শান্তি ভঙ্গ না করেন। কেউ যেন ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে না যান।'

পাশের ভদ্রলোক বললেন, "তাইল্যান্ডের পাইলট ভারতীয় প্যাসেঞ্জারকে ভদ্র হতে বলছেন! তবু এদের শিক্ষা হয় না!"

"আপনি কি প্রায়ই এদের দেখেন?"

"মাসে তিনবার আমাকে যেতে হয়। প্রতিবার এই ছলিগানগুলোকে দেখতে হয়!"

"ব্যাঙ্ককেই যান?"

"না। সাংহাই। সেখানে আমার ব্যবসা আছে। আপনি?"

"আমি ব্যাঙ্ককে যাচ্ছি।"

"বেড়াতে?"

"না," মাথা নাড়তে-নাড়তে কথাটা বানিয়ে ফেলল অমল, "ওখানে আমার এক পরিচিত থাকেন। তিনি আমাকে চাকরির আশ্বাস দিয়েছেন।"

"ব্যাঙ্ককে চাকরি?" ভদ্রলোক হাসলেন, "দেখুন!"

এই সময় এয়ার হোস্টেসদের দেখা গেল। খাবারের ট্রলি ঠেলে এগিয়ে আসছেন। এই রাতদুপুরে মাটি থেকে অন্তত ২৫ হাজার ফুট উঁচুতে প্লেন যখন উড়ছে, তখন ওরা কী খাবার দিচ্ছে, তা জানার আগ্রহ হল অমলের। ঢাকায় যাওয়া-আসার সময় তো কিছুই দেয়নি।

এয়ার হোস্টেস জিজ্ঞেস করলেন, "ভেজ?"

পাশের ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "নন ভেজ!" তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা আগেই খাবার দিচ্ছ, ড্রিঙ্ক দেবে না?"

"দিতাম," তারপর গলা নিচু করে এয়ার হোস্টেস বললেন, "আজ কয়েকজন রাউডি প্যাসেঞ্জার থাকায় ড্রিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে না। আপনি ভেজ?"

বাক্স দু'টো দিয়ে এয়ার হোস্টেস ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, "যদি ড্রিঙ্ক দেওয়া হত, তা হলে আপনি কী নিতে পছন্দ করতেন?"

"অবশ্যই স্কচ!" ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

একটু আড়াল রেখে ট্রলির ভিতর থেকে দু'টো গ্লাসে স্কচ ঢেলে ওদের দিয়ে এয়ার হোস্টেস এগিয়ে গেল পরের যাত্রীদের দিকে। ভদ্রলোক বললেন, "দেখুন, কীরকম চোরের মতো ড্রিঙ্ক নিতে হচ্ছে ওই বদমাইশগুলোর জন্য!"

অমল বলল, "আমাকে কেন দিল? আমি তো চাইনি!"

"আপনি ড্রিঙ্ক করেন না?"

"না।"

ভদ্রলোক অমলের গ্লাসটা টেনে নিয়ে নিজেরটার পাশে রাখলেন। বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ। আমার দু'টো না খেলে ভাল লাগে না।"

প্যাকেট খুলল অমল। ভাত, মুরগির মাংসের ঝোল, সঙ্গে অনেক স্যালাড, দই রয়েছে। এত রাতে খাওয়ার কোনও মানে হয় না। বাড়ির খাবার এখনও হজম হয়নি। সে বলল, "আপনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে যা ইচ্ছে নিতে পারেন।"

"সে কী! আপনি খাবেন না?" ভদ্রলোক তাকালেন।

"না, খিদে নেই।"

এয়ার হোস্টেস খালি প্যাকেট, গ্লাস ফেরত নিয়ে গেলে ভদ্রলোক বললেন, "এবার একটু ঘুমিয়ে নিন। আমরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছি।"

"কী করে বুঝলেন?"

"এই তো, সামনের মনিটরে ম্যাপ দেখাচ্ছে। প্লেন এখন কোথায় আছে, তা দেখলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু আমার সাজেশন, দেখবেন না। ওটা নেশার মতো। তার চেয়ে ঘুমিয়ে নিয়ে কালকের জন্য চাঙ্গা হোন। সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে প্লেন নামলে চোখ খুলবেন।" বলে ভদ্রলোক সিট হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারল না অমল। এই প্লেন নামবে সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে। নামটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না, বাংলা বলেই মনে হয়। সে সামনের খোপে রাখা তাই এয়ারলাইন্সের নিজস্ব ম্যাগাজিনটা টেনে পাতা উল্টাতেই দেখতে পেল, এয়ারপোর্টের তাই উচ্চারণ হল, স্যু-ওয়ান-না-পুম! সিটি সেন্টারের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে এই এয়ারপোর্টটির আগে ব্যাঙ্ককে আর একটি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট ছিল। তার নাম ডন মুয়েং এয়ারপোর্ট, যা এখন রয়্যাল তাই এয়ারফোর্সের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়।

ব্যাঙ্ককের আকাশে তখন দিনের আলো, প্লেন রানওয়েতে নেমে পড়ল ধীরে-ধীরে।

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি তো এসে গেলেন। আমাকে আবার প্লেন ধরতে হবে দু'ঘণ্টা পরে। আপনার নামটা জানা হয়নি।"

অমল নাম বললে ভদ্রলোক তাঁর কার্ড বের করে দিলেন, "যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আপনার কোয়ালিফিকেশন জানতে পারি?"

"অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছি। তারপর থেকেই চাকরি খুঁজছি।"

"কম্পিউটার জানেন?"

"সামান্য। ডেটা এন্ট্রির মতো প্রাথমিক ব্যাপারগুলোই জানা আছে।"

"হুম, সাংহাইতে গিয়ে থাকতে পারবেন?"

"মানে?"

"দেখুন ভাই, ওখানকার অফিসের জন্য একজনকে খুঁজছি, যে পরিশ্রম করতে পারবে, কিন্তু কোনও নেশায় আসক্ত হওয়া চলবে না। ওখানে যাদের পাচ্ছি, তারা পরিশ্রম নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু একটা না-একটা নেশা না হলে তাদের চলে না। কাল দেখলাম, আপনি বিনা পয়সায় পাওয়া স্কচও খেলেন না! তাই বলছি, ব্যাঙ্ককে যদি চাকরি না পান, তা হলে যোগাযোগ করবেন। ফোন করার দরকার নেই, মেল পাঠাবেন।"

প্লেন থেকে নামতেই যাত্রীদের দুটো ভাগে আলাদা করা হল। যাঁরা অন্য দেশে যাবেন, তাঁরা ট্রানজিট লেখা পথে চলে গেলেন। অমল অন্যদের সঙ্গে এগিয়ে গেল ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকে। সেখানে লম্বা লাইন। তার চোখ গেল ওই ক্যারিয়ার ছেলেগুলোর দিকে। আশ্চর্য ব্যাপার! কলকাতায় এবং প্লেনে যারা নিজেদের বিক্রম দেখাচ্ছিল, তারা এখন ভিজে বেড়ালের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে আছে! চিৎকার তো দূরের কথা, একটা শব্দও মুখ থেকে বের করছে না। পাসপোর্ট আর ফর্ম ধরে রেখেছে মুঠোয়। এমন পরিবর্তনের নিশ্চয়ই কারণ আছে।

অমলের যখন সময় এল, তখন সে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে তার পাসপোর্ট এবং ফর্ম এগিয়ে দিল। সেগুলো দেখে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এসেছেন?"

"বেড়াতে।"

"বেড়ানো সুন্দর হোক!" পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে ফিরিয়ে দিলেন অফিসার।

এখন সদ্য সকাল। এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে অমল দেখল

অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মানুষজন খুবই কম। যারা এখনই বেরিয়ে এসেছে, তাদের অনেকেই মালপত্র নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ওপাশে। ওই ছেলেগুলো হাঁটছে সেদিকে। কিছু না ভেবেই অমল ওই দলের পিছনে হাঁটতে লাগল। খানিকটা হাঁটার পর স্টেশন চোখে পড়ল। স্টেশনে ঢুকে একটা বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা দেখতে পেল। তিন রকমের ট্রেন আছে। স্কাই ট্রেন, এয়ারপোর্ট রেল লিঙ্ক, মেট্রো। অমল ঠিক করল, ট্রেনে উঠে শহরের মাঝখানে চলে যাবে। ঢাকা বা কলকাতায় এয়ারপোর্ট যখন শহর থেকে কিছুটা দূরে, তখন এখানেও সেটাই হবে। সে টিকিট কাউন্টারের দিকে পা বাড়াতেই কানে এল, "এক্সকিউজ মি!"

মুখ ফিরিয়ে অমল দেখল, উনিশ-কুড়ি বছরের মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ওর পরনে জিন্স আর লাল টি-শার্ট। কাছে এসে মেয়েটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি ব্যাঙ্ককে থাক?"

"না। আমি কলকাতা থেকে আসছি," অমল জবাব দিল।

মেয়েটির কপালে ভাঁজ পড়ল, "তা হলে তোমার লাগেজ কোথায়?"

"দরকার হবে না।"

"তুমি ইন্ডিয়ার কোন প্রভিন্সের মানুষ?"

"ওয়েস্ট বেঙ্গল।"

"মাই গড! আপনি নিশ্চয়ই বাঙালি?" শেষ তিনটি শব্দ বাংলায় উচ্চারণ করল মেয়েটি।

অবাক হয়ে গেল অমল! মুখে কিছু না বলে সে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

"উঃ। আমি খুব লাকি! একজন বাঙালিকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"সে কী! এই ফ্লাইটেই তো অনেক বাঙালি এসেছেন।"

"বেশিরভাগই ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। আর এসেছে ওই ক্যারিয়ারগুলো। এদের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না," মেয়েটি অমলের পাশে এসে দাঁড়াল, "আমার নাম রিজুলা, আমাকে সাহায্য করবেন?"

"কী ধরনের সাহায্য?"

"আপনাকে খুলেই বলছি। আমার বাড়ি কলকাতার কাছে, ব্যারাকপুরে। একটা চাকরি নিয়ে এসেছিলাম। তিন মাস আগে। প্রথম মাসে মাইনে দিয়েছিল ঠিকঠাক। দশ দিনের ট্রেনিং নিয়ে টুরিস্ট গাইডের কাজ করতাম। মাসখানেক পরে আমাকে বলা হল, এসকর্ট হিসেবে কাজ করতে। আমি আপত্তি করায় ওরা স্যাক করল।" রিজুলা বলল।

"এসকর্ট মানে?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"যারা বাইরে থেকে ব্যাঙ্ককে বেড়াতে আসবে দু'-তিনদিনের জন্য, তাদের সঙ্গে থেকে আনন্দ দিতে হবে। চাকরির বিজ্ঞাপনে একথা লেখা ছিল না," রিজুলা বলল।

"সর্বনাশ!" অমলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা।

"হ্যাঁ, সর্বনাশ আমার হয়ে গেল। ওরা এক পিঠের টিকিট পাঠিয়েছিল। চাকরি যাওয়ার পর এই দু'মাস প্রথম মাসের মাইনেতে চলে গিয়েছে। ফেরার টিকিট কাটার ভাড়া পকেটে নেই। পেনিনসুলা প্লাজায় একটা পার্টটাইম সেলসগার্লের চাকরি পেয়েছি বলে থাকা-খাওয়াটা কোনওমতে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। আমি একজনকে চাইছি, যিনি আমাকে সাহায্য করলে আমি দেশে ফিরে গিয়ে শোধ করে দেব," রিজুলা বলল।

"আপনি টিকিটের দামটা সাহায্য চাইছেন?"

"হ্যাঁ।"

"দেশে ফোন করে বললেই তো ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পেতে পারেন। কোনও অ্যাকাউন্ট খোলার দরকার নেই। পাসপোর্ট দেখালেই তো হয় বলে শুনেছি।"

"কাকে ফোন করব? বাবা নেই। আমি এখানে আসায় দাদা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে! ফোন করলে ও কখনও টাকা পাঠাবে না।"

"আর কোনও আত্মীয় বা বন্ধু নেই?"

"থাকলে কি এভাবে রোজ সকালে এখানে আসি?"

মাথা নাড়ল অমল, "আমার খুব খারাপ লাগছে আপনার কথা শুনে," কিন্তু আমি আজ রাতেই ফিরে যাব। সঙ্গে সামান্য ভাট আছে। আমি চাইলেও আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।"

"আমার কপালটাই এরকম," রিজুলা তাকাল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"শহরটা দেখব। তারপর..." মিস্টার আহমেদের দেওয়া কার্ড বের করে দেখে বলল, "উচ্চারণ ভুল হতে পারে, প্ল্যাটুনাম ফেচাবুরি, প্ল্যাটুনাম মার্কেটে যাব।"

রিজুলা হাসল, "ওই জায়গাটা হল ব্যাঙ্ককের সবচেয়ে বড় রেডিমেড গার্মেন্টসের বাজার। কিনবেন, না কারও সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?"

"কেনার পয়সা কোথায়। দেখা করতে যাব," অমল বলল, "আপনি কি ওর কাছাকাছি কোথাও থাকেন?"

"মাক্কাসান বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে একটা ছোট্ট ঘরে আর একজন মেয়ের সঙ্গে শেয়ার করে থাকি। চলুন, আপনি তো ট্রেনে যাবেন। আমার মান্থলি আছে, আপনারটা কাটুন। এক কাজ করুন, একটা সারাদিনের টিকিট কেটে নিন, অনেক সস্তা হবে," রিজুলা বলল।

চারটে স্টেশন পেরিয়ে এসে রিজুলা বলল, "আমি পরেরটায় নামব। আপনি ইচ্ছে করলে নামতে পারেন। আমার তো বিকেলের আগে ডিউটি নেই, শহরটা দেখাতে পারি।"

অমল বুঝতে পারছিল না, মেয়েটি ধান্দাবাজ কিনা। এরকম গল্প সে অনেক শুনেছে। অপরিচিত মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে কতটা নিঃস্ব হবে? ফেরার টিকিট, পাসপোর্ট আর দু'হাজারের কিছু কম ভাট ছাড়া সম্পত্তি বলতে তো কিছু নেই। আর আছে সারাদিনের টিকিট। ভাটগুলো নিয়ে যদি ও কেটে পড়ে তাহলেও সে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেতে পারবে। অমল বলল, "ঠিক আছে, চলুন।"

স্টেশনের বাইরে এসে মোটেই খুশি হল না অমল। বিদেশ বলতে যে ছবি মনে আসে, তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। একটু অগোছালো, যারা রাস্তায়, তাদের মধ্যে স্থানীয় লোক যেমন আছে, ভারতীয়ও কম নেই।

রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি খিদে পেয়েছে?"

"একটু-একটু। প্লেনে খাবার দিয়েছিল মাঝরাতে, খাইনি," অমল হাসল।

"তা হলে চলুন। ব্যাঙ্ককের সবচেয়ে নামী রেস্তরাঁ হল ইন্টারন্যাশনাল। মোটামুটি তিনশো ভাট খরচ হবে," রিজুলা বলল, "আর খাও সান রোডে গেলে অল্প দামের খাবার পাবেন। তাই খাবার পছন্দ করেন?"

"কখনও খাইনি।"

"তা হলে চলুন, আজ টেস্ট করবেন।"

একটু হাঁটতেই দেখা গেল সকাল-সকাল চাকাওয়ালা কাঠের ভ্যানে খাবার নিয়ে দোকান বসে গিয়েছে রাস্তার পাশে। এরকম একটার সামনে দাঁড়িয়ে রিজুলা অর্ডার দিল দু'টো প্যাড তাই-এর। লোকটা খুব দ্রুত দুই প্লেট বানিয়ে এগিয়ে দিতে রিজুলা বলল, "খেয়ে নিন। ফ্রায়েড রাইস-নুডলস, সঙ্গে ডিম, মাছের সস, ট্যামারিন্ড সস আর লাল লঙ্কা দেওয়া।"

অমল খাওয়া শুরু করে বুঝল, ভাল না লাগলেও খাওয়া যায়। রোজ খেলে কী হত, তা অবশ্য বলা যাচ্ছে না। খাওয়া শেষ করে সে জিজ্ঞেস করল, "কত দিতে হবে?"

রিজুলা বলল, "পঞ্চাশ ভাট পার প্লেট। আপনাকে দিতে হবে না।"

"কেন?" পকেট থেকে একশো ভাট বের করে দোকানদারকে দিয়ে দিল সে।

রিজুলা হাসল, "আপনি যদি এভাবে আমার প্লেনের টিকিটটা কিনে দিতেন!"

"অত টাকা আমার সঙ্গে নেই। কী করে দেব?" অমল বলল।

"আপনি তো আজই চলে যাবেন। বলুন, কী-কী দেখবেন?"

"যা-যা দেখা সম্ভব। তবে আমাকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে প্ল্যাটুনাম মার্কেটে," অমল বলল।

ওরা প্রায় পায়ে হেঁটে অথবা অটো রিকশায়, যাকে এখানে টুকটুক বলা হয়, শহরটায় কিছুটা ঘুরে দেখল। অমল খুব মজা পাচ্ছিল, যখন রিজুলা টুকটুকওয়ালার সঙ্গে বিস্তর দরাদরি করে তাকে রাজি করাচ্ছিল কম ভাড়ায় যেতে। রিজুলার কথায়, এদেশের ট্যাক্সিওয়ালা-টুকটুকওয়ালাদের অধিকাংশ টুরিস্ট দেখলেই গলা কাটে। বেশিরভাগ টুরিস্ট এখানে আসে সেক্স লাইফ দেখতে। কেউ-কেউ সেটা উপভোগও করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই বিপদে পড়ে।

প্ল্যাটুনাম মার্কেটে গিয়ে অবাক হয়ে গেল অমল। বিশাল রেডিমেড জামাপ্যান্টের ব্যবসা। বেশ ভিড় এখানে। রিজুলা থাকায় ওরা একটা বড় দোকানে পৌঁছতে পারল, যেখানে মিস্টার আহমেদের লোকের থাকার কথা। কার্ডে নাম লেখা আছে, মুজিব হক। ওরা ভিতরে ঢুকে একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলে, সে ম্যানেজারকে দেখিয়ে দিল। ম্যানেজার খানিকটা জিজ্ঞেসবাদ করে ফোন অন করে উর্দুতে জিজ্ঞেস করল, ইন্ডিয়া থেকে মিস্টার আহমেদের লোক এসেছে, পাঠিয়ে দেবে কিনা।

উত্তর শুনে এক কর্মচারীকে ম্যানেজার নির্দেশ দিল বড়সাহেবের কাছে ওদের নিয়ে যেতে। ভিতরের দরজা দিয়ে একটু এগিয়ে লিফটে উঠল ওরা। চার তলার একটা বন্ধ দরজার সামনে যে বেয়ারা বসে আছে, তার কাছে ওদের পৌঁছে দিয়ে লোকটা ফিরে গেল। সেই বেয়ারা তাদের নিয়ে গেল একটি বিশাল ঘরে যা দামি আধুনিক আসবাবে সাজানো। বেশ রোগা এবং খাটো চেহারায় একটি মানুষ সাধারণ শার্ট পরে বসেছিলেন যে টেবিলের

পিছনে, তাঁর দিকে এগোতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "মিস্টার আহমেদের কাছ থেকে এসেছ শুনলাম। কিন্তু তিনি তো একথা জানাননি।" মিস্টার হক কথা বললেন চমৎকার হিন্দিতে।

অমল কার্ডটা এগিয়ে দিল, যার পিছনে মিস্টার আহমেদ কিছু লিখেছিলেন। অমলের মনে হয়েছিল, ওটা সাংকেতিক ভাষা। পড়ার পর শব্দ করে হাসলেন মিস্টার হক। একটা কৌটো খুলে তার থেকে মশলাজাতীয় কিছু বের করে মুখে পুরে বললেন, "তা হলে এটা তোমার ট্রেনিং ট্রিপ। পড়াশোনা কত দূর?"

"অনার্স গ্রাজুয়েট।"

"নাম?"

"অমল।"

"ইনি তোমার কে হন? বান্ধবী?"

অমল অবাক হয়ে শুনল, রিজুলা বলছে, "হ্যাঁ।"

মিস্টার হক বললেন, "আমি অবাক হচ্ছি, মিস্টার আহমেদ কখনও কাউকে ট্রেনিং দিতে ব্যাঙ্ককে পাঠাননি। মনে হচ্ছে, ম্যাডাম তোমাকে পছন্দ করেছেন। তুমি কি আজই ফিরে যাচ্ছ, না কয়েকদিন থাকবে?"

"আজই ফিরে যাওয়ার কথা।"

মিস্টার হক মোবাইলের বোতাম টিপলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তিনি মিস্টার আহমেদের সঙ্গে কথা বললেন। অমল তাঁর কাছে এসেছে জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ওকে কোনও কাজ দেওয়া হয়েছে কিনা। তারপর হেসে বললেন, "হার হাইনেস নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভেবেছেন।"

ফোন বন্ধ করে মিস্টার হক বললেন, "অমল, তোমাকে যখন ম্যাডাম পছন্দ করেছেন, তখন মনে হচ্ছে, তুমি ভাল মানুষ। কিছু রোজগার করতে চাও?"

"কীভাবে?"

"একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ, এক ফুট বাই দশ ইঞ্চি, সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। দমদম এয়ারপোর্টের বাইরে লোক অপেক্ষা করবে। সে তোমাকে বলবে, ঈদ মুবারক। তিনবার বলবে। তাকে তুমি ব্যাগটা দিয়ে দেবে," মিস্টার হক বললেন।

"ব্যাগে কী থাকবে?" অমল জিজ্ঞেস করা মাত্র মিস্টার হক সোজা হয়ে বসলেন। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি খুব অবাক হয়েছেন। বললেন, "গেট লস্ট।"

উনি যখন চলে যেতে বলছেন, তখন থাকার কোনও মানে হয় না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রিজুলা বলে উঠল, "স্যার, ও না বুঝে জিজ্ঞেস করে ফেলেছে।"

"অদ্ভুত ব্যাপার! মিস্টার আহমেদ তোমাকে শেখাননি যে, এই প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই।" মিস্টার হক তখনও উত্তেজিত।

"আমি দুঃখিত স্যার," অমল বলল।

মিস্টার হক রিজুলার দিকে তাকালেন, "তুমিও ওর সঙ্গে ফিরে যাবে?"

"হ্যাঁ স্যার, আমার নাম রিজুলা।"

"ব্যাঙ্ককে এসে কোনও প্রেমিক-প্রেমিকা নিশিযাপন না করে ফিরে যাচ্ছে, এই প্রথম শুনলাম! শোনো অমল, কাজটা আমি তোমাকে দিচ্ছি। তার জন্যে আমি ভাল পারিশ্রমিক দেব। কিন্তু একথা তোমার কোম্পানিকে তুমি জানাবে না।"

"যদি ওঁরা জানতে পারেন?"

"পারবে না। আচ্ছা, তুমি কি এই ট্রিপের জন্য টাকা পাচ্ছ?"

"মিস্টার আহমেদ বলেছেন, ওটা ম্যাডামের উপর নির্ভর করছে।"

"আমি তোমাকে সাজেস্ট করছি, নিও না। টাকা না নিলে তোমার কোনও অবলিগেশন থাকবে না। ওকে? কাদের ফ্লাইটে এসেছ?"

"তাই এয়ারওয়েজ।"

"তুমি সাড়ে ন'টার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে। এই ফোনটা সঙ্গে রাখবে। ফোনে একজন জানতে চাইবে, তুমি ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। জেনে নিয়ে তোমাকে ব্যাগ আর পারিশ্রমিকের টাকা পৌঁছে দেবে। তুমি পেমেন্ট ইন্ডিয়ান টাকায় পাবে। হ্যান্ড ব্যাগেজে নেবে না। চেক-ইন ব্যাগেজে দেবে।"

এবার রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "স্যার, অ্যামাউন্টটা জানতে পারি?"

"কেন?"

"তা হলে আমরা শপিং করতে পারতাম।"

"ওকে আট হাজার ইন্ডিয়ান টাকা দেওয়া হবে। ম্যাডাম যা দেবেন। তার ডবল, বা তারও বেশি। কিন্তু টাকাটা এয়ারপোর্টেই পাবে। ওকে!"

মোবাইল সেটটা এগিয়ে দিলেন মিস্টার হক।

বাইরের রাস্তায় নেমে রিজুলা আচমকা হাত মুঠো করে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, "ওঃ গড! ইউ আর দেয়ার।"

"কী হল?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"আমার প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেল।" হাসল রিজুলা, "এখন তো আর আমাকে টাকা দিতে অসুবিধে হবে না?"

"কিন্তু টাকা তো দেবে এয়ারপোর্টে গেলে। টিকিট কী করে কাটবে?"

"এয়ারপোর্টেই কাউন্টার আছে," ঘড়ি দেখল রিজুলা, "তুমি আমার সঙ্গে একটু চলো। ঘর থেকে জিনিসপত্র যেটুকু পারি, নিয়ে আসি," হাত নেড়ে একটা রানিং অটো রিকশা থামাল সে।

একটা ঢাউস সুটকেস নিয়ে আবার অটো রিকশায় বসে রিজুলা অমলকে নিয়ে এল খাওসান রোডে। এই রাস্তায় যেন কাবারের দোকানের মেলা বসে গিয়েছে।

রিজুলা বলল, "প্লেনে কখন খেতে দেবে জানি না। মাঝরাতে দেবে কিনা কে জানে। এখানেই পেট ভরে খেয়ে নিলে ভাল হয়। কী খাবে?"

একটা ভ্যানের সামনে ওরা দাঁড়িয়েছিল। তার উপর কাঁচের বড় পাত্রে চিংড়ির মতো খাবার রয়েছে, সেটা দেখিয়ে অমল জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী খাবার?"

রিজুলা হাসল, "বাগস।"

"মানে, পোকা?"

"ইয়েস স্যার। কড়া করে ভেজে সয়া সস উপরে ছড়িয়ে দেবে। কাঁকড়া বিছে, জলফড়িং, কেঁচো থেকে শুরু করে অনেক কিছু। খাবেন?"

"অসম্ভব!" সরে এল অমল।

ওপাশের দোকানে গিয়ে চিকেন চাউয়ের অর্ডার দিল রিজুলা। খেতে গিয়ে অমলের মনে হল, চায়না টাউনের খাবার খাচ্ছে।

ওরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ন'টার সময়। মেন গেটে অমলকে দাঁড়াতে বলে টিকিটের খোঁজ নিতে চলে গেল রিজুলা। মেয়েটা একটু অন্যরকম। চিকেন চাউয়ের দাম জোর করে দিয়েছে। বলেছে, শেষ ভাটটিও সে এখানেই খরচ করে যেতে চায়। ব্যারাকপুরে গিয়ে দাদার বাড়িতে উঠলে কীরকম অভ্যর্থনা পাবে কে জানে! আর মফস্‌সল শহরে থেকেও অত সুন্দর উচ্চারণে ইংরেজি বলার অভ্যেস তৈরি হল কী করে! তারপরই মনে হল, যে আট হাজার টাকা পাওয়া যাবে, তার অনেকটাই হয়তো টিকিট কাটতে চলে যাবে! ব্যাপারটা জানলে ম্যাডাম নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। তাকে বাদ দিতেও পারেন। তা ছাড়া ঝুঁকি নিতে তো তাকেই হবে। ব্যাগের ভিতরে কী আছে, তা সে জানবে না। যদি গাঁজা, চরস হয়? অথবা সোনার বার? ধরা পড়লে নির্ঘাৎ জেল!

এই সময় তার পকেটের মোবাইল বেজে উঠল। ওটা অন করতেই প্রশ্ন এল হিন্দিতে, "আপনার নাম?"

"অমল।"

"আপনার সঙ্গে কে আছে?"

"কেউ নেই।"

"সে কী?" কণ্ঠে বিস্ময়।

"সরি! আমার বান্ধবী আছে।"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"কলকাতায়।"

"এই মুহূর্তে মেন গেটের কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?"

"সামনেই একটা স্মোকিং জোন আছে।"

"আমি আসছি। আপনি মোবাইলের লাইন কাটবেন না," কানে সেটটা চেপে রাখল অমল। হঠাৎ শুনল, "আপনি বাঁ হাত উপরে তুলুন। থ্যাঙ্ক ইউ।" লাইন কেটে গেল। একজন টাই পরা লোক সামনে এসে দাঁড়াল, "এই নিন ব্যাগ। আর এই হল পে-প্যাকেট। এবার ওই মোবাইল সেটটা আমাকে ফেরত দিন।"

সুদৃশ্য চামড়ার ছোট ব্যাগ, যা এক ফুটের বেশি চওড়া নয় আর একটা খাম হাতে ধরিয়ে দিয়ে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল! অমল লক্ষ করল, এত ছোট ব্যাগ, প্রায় হ্যান্ড ব্যাগের মতো, কিন্তু খোলার কোনও ব্যবস্থা নেই। চারপাশেই চামড়া, কোনও বোতাম বা জিপ নেই। ওজন প্রায় এক কিলোর একটু বেশি হবে। কী আছে এর ভিতরে?

এই সময় রিজুলা ফিরে এল হাসিমুখে, "এখনও এগারোটা সিট খালি আছে। আরে, এর মধ্যেই ওগুলো দিয়ে গিয়েছে?" হাত বোলাল সে ব্যাগে।

"হ্যাঁ।"

"দিন, টিকিট কেটে নিয়ে আসি। ওরা কি ইন্ডিয়ান রুপিতে দিয়েছে?"

"খুলে দেখিনি," অমল বলল।

রিজুলা খাম নিয়ে টাকাগুলো বের করে দেখাল, এক হাজার ভারতীয় টাকার আটটি নোট। বলল, "চলুন।"

"কোথায়?"

"টিকিটের দাম হয় ডলারে, নয় ভাটে দিতে হবে। মানি এক্সচেঞ্জের শপ থেকে কনভার্ট করে নিয়ে আসি," রিজুলা হাসল, "আমি একা গেলে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, এগুলো নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারি।"

"কী আর করা যাবে! তাড়াতাড়ি যাও। পুরোটা কনভার্ট কোরো না।"

সব কিছু করে রিজুলা ফিরল পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। এতক্ষণ অমল মানুষ দেখছিল। আজ ভোরে যারা কলকাতা থেকে তার সঙ্গে একই ফ্লাইটে এখানে এসেছিল, তাদের অনেককেও দেখতে পেল। আলাদা দলে বড়-বড় পিচবোর্ডের পেটি নিয়ে ঢুকছে। কিন্তু এখন ওরা চিৎকার-চেঁচামেচি করছে না। এই অশিক্ষিত, অসভ্য ছেলেগুলোকে ক্যারিয়ার বলা হয়। এরাও কি একটা ট্রিপ করলে তিন হাজার টাকা পায়? ওই পেটিগুলোতে কী আছে, তা নিশ্চয়ই ওরাও জানে না। অবৈধ কিছু থাকলে জেলে যেতেই হবে। হঠাৎ অমলের মনে হল, এযাত্রায় যা করার কথা ছিল না, তা মিস্টার হক করে দিয়েছেন! তাকেও একটা ব্যাগ ক্যারি করতে হচ্ছে, যার ভিতরে কী আছে, তা তার জানা নেই। আট হাজারের মধ্যে নিশ্চয়ই হাজারছয়েক বেরিয়ে যাবে রিজুলার টিকিটের জন্য। দু'হাজার টাকার জন্য কত মাস জেলে থাকতে হবে যদি এই ব্যাগে অবৈধ কিছু থাকে?

তখনই অমলের মনে পড়ল, মিস্টার হক বলেছেন, হাতে না নিয়ে চেক ইন ব্যাগেজে এটাকে দিয়ে দিতে। তার তো কিছুই দেওয়ার নেই। সে পায়ের পাশে রাখা রিজুলার সুটকেসটার দিকে তাকাল। ওই সুটকেসেই এটা যাক।

রিজুলা ফিরে এসে বলল, "অনেক বেশি নিয়েছে।"

অমল বলল, "ব্যালেন্সটা তোমার কাছে রেখে দিয়ে এখন ওই সুটকেসটা খোলো।"

"কেন?" রিজুলা জিজ্ঞেস করল।"

"এই ব্যাগটাকে ওর মধ্যে ঢোকাও। মিস্টার হক বলেছিলেন, মনে নেই?"

রিজুলা চামড়ার ব্যাগটার দিকে তাকাল, "কিন্তু..."

অমল বলল, "জানি না, এখানে কেউ চেক করবে কিনা!"

রিজুলা মাথা নাড়ল, "এখানে তো বোর্ডিং কার্ড দেওয়ার সময় সুটকেস নিয়ে লাগেজ ট্যাগ দিয়ে দেবে। কলকাতায় খুলে দেখাতে বলতে পারে।"

"আপাতত ওটা কলকাতা পর্যন্ত যাক। মিস্টার হকের কাছ থেকে যখন টাকা নিয়ে ফেলেছি, তখন ব্যাগটা এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না," অমল বলল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুটকেস খুলে জামাকাপড়ের মধ্যে চামড়ার ব্যাগটাকে ঢুকিয়ে দিল রিজুলা। তারপর ওরা ভিতরের দিকে এগোল। ফেন্সিং পেরিয়ে বোর্ডিং কাউন্টারে যাওয়ার আগে প্রতিটি যাত্রীকে তাদের লাগেজ এক্স রে করিয়ে নিতে হচ্ছে। রিজুলার সুটকেসও এক্স রে মেশিনে ঢুকল। বেরিয়ে এলে লকের গর্তে প্লাস্টিকের বাঁধন লাগিয়ে দিল ওরা। সেটা নিয়ে কাউন্টারে গেলে বোর্ডিং কার্ড পাওয়া গেল। সুটকেসটা নিয়ে নিল এয়ারলাইন্স। বোর্ডিং কার্ডে লাগেজ ট্যাগ আটকে দিল ওরা।

ইমিগ্রেশন-সিকিউরিটির পর্ব শেষ করে অনেকটা পথ হাঁটতে হল নির্দিষ্ট গেটে পৌঁছতে। গিয়ে দেখল, অনেক যাত্রী সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। সেই ক্যারিয়ার ছেলেদের দলও একদিকে বসে গল্প করছে। কিন্তু এখন ওরা চেঁচাচ্ছে না অথবা এমন কিছু করছে না, যাতে নজরে পড়ে যাবে।

ওদের ইশারায় দেখিয়ে অমল বলল, "ওরা প্রত্যেকেই অবৈধ জিনিস নিয়ে যাচ্ছে!"

একবার তাকিয়ে রিজুলা বলল, "জানি, যা রোজগার করে তার বেশিরভাগই ব্যাঙ্ককের মেয়েদের পিছনে নষ্ট করে। 'গো গো' বারের নাম শুনেছ?

"না," মাথা নাড়ল অমল।

"'গো গো' বার ব্যাঙ্ককে অনেকের কাছে আকর্ষক জায়গা। একশো থেকে দেড়শো ভাটে একটা ড্রিঙ্ক পাওয়া যায় ওখানে। বারের মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে চাইলে অনেক বেশি দাম দিতে হয়। অনেকেই পছন্দমতো মেয়েকে বারের বাইরে নিয়ে যায়। কিন্তু তার জন্যে বার মালিক ছ'শো ভাট ট্যাক্স নেয়। যারা বেশি খরচ করতে পারে না, তাদের কাছে ওই 'গো গো' বার চমৎকার ফুর্তির জায়গা।" রিজুলা হাসল।

"তুমি তো মাত্র তিন মাস ব্যাঙ্ককে ছিলে, এত জানলে কী করে?"

"এসব কথা জানার জন্য মানুষ মুখিয়ে থাকে!"

এবার ডাক পড়ল। লাইন দিয়ে প্লেনের ভিতরে ঢুকল ওরা। অমল লক্ষ করছিল, ওই ক্যারিয়ার ছেলেগুলো এখনও চুপচাপ এবং ওদের সঙ্গে একটা হ্যান্ডব্যাগও নেই। নিশ্চয়ই বিরাট পেটিগুলো চেক-ইনে দিয়ে এসেছে।

জানলার ধারে বসেছিল রিজুলা। বসেই সামনের সিটের পিছনে যে টিভি মনিটর রয়েছে তা অন করে দিয়ে বলল, "প্লেনে আমি ঘুমতে পারি না। এই কয়েক ঘণ্টা সিনেমা দেখে কাটাব।"

"সারাদিন ধরে এত ঘুরলে, টায়ার্ড হওনি?"

"দূর!"

প্লেন আকাশে ওড়ার আগে পর্যন্ত পরিবেশ শান্ত ছিল। উপরে উঠতেই যে চিৎকার ভেসে এল, তা যে ওই ক্যারিয়ারদের, তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণের জন্য নয়। অন্য যাত্রীদের তীব্র প্রতিবাদে শান্ত হল ওরা।

আপেল জুসের পর যে খাবার দিয়েছিল এয়ারহোস্টেস, তার সবটাই খেয়ে নিল রিজুলা। এবার অমল দু'-তিনটে টুকরো মুখে দিয়ে বুঝতে পারল, ভরা পেটে আর খাওয়া যাবে না। চোখ বন্ধ করে ঘুমাবার চেষ্টা করল সে।

খানিক বাদে রিজুলার গলা কানে এল, "তুমি আমাকে ঠিকানা দিলে না!"

চোখ মেলল অমল, "কী বলছ?"

"টাকাটা তোমাকে কোথায় গিয়ে ফেরত দেব?"

"ও, লিখে নাও। আমার মোবাইলে ফোন করলেই হবে," নম্বর বলল সে। দ্রুত লিখে নিল রিজুলা। লিখল বোর্ডিং কার্ডের পিছনে।

"তুমি কি ব্যারাকপুরের বাড়িতে উঠবে?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"না, ওখানে পরে যাব। উল্টোডাঙায় আমার একজন মাসি থাকেন, আপাতত তার ওখানেই উঠব," রিজুলা বলল, "আচ্ছা, তোমার কোনও সোর্স আছে, যেখানে অ্যাপ্রোচ করলে চাকরি পাওয়া যেতে পারে?"

ম্যাডামের মুখ মনে পড়ল অমলের। উনি কি মেয়ে ক্যারিয়ার রাখেন? তা ছাড়া সে কোনও মেয়ের নাম রেফার করলে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে! তারপরই অদ্রিজার কথা মনে এল। অদ্রিজা তাকে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু এসব চাকরির মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার থাকলেও অপরাধ মিশে আছে। কিন্তু এঁদের চেয়ে যাওয়ার সময় প্লেনে যে ভদ্রলোক আলাপ হওয়ার পর তাকে কার্ড দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে চাকরি করাটা অনেক বেশি নিরাপদ বলে মনে হল অমলের। সে পকেট থেকে ভদ্রলোকের দেওয়া কার্ড বের করে রিজুলাকে দিল, "এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাওয়ার সময় প্লেনে আলাপ হয়েছিল। ওঁর সাংহাইতে যে অফিস আছে, তার জন্য লোক খুঁজছেন।"

"আমাকে তো উনি চিনবেন না!"

"আমার নাম আর আলাপের জায়গাটার কথা লিখে মেল করবে। লিখবে, যিনি ড্রিঙ্ক করেন না, তিনি অ্যাপ্লাই করতে বলেছেন।"

"ওঃ!"

"সাংহাই যেতে আপত্তি নেই তো?"

"নরক ছাড়া যে-কোনও জায়গায় যেতে পারি।"

দমদম এয়ারপোর্টে যখন প্লেন নামল, তখন মাঝরাত। যাত্রীরা প্লেন থেকে নামতেই কিছু লোক দুদ্দাড় দৌড়ে ভিতরের দিকে চলে গেল। অমল পরে বুঝতে পারল, ওরা দৌড়ে এসেছে, যাতে ইমিগ্রেশনের জন্যে লাইনের সামনে দাঁড়াতে পারে।

রিজুলার পাসপোর্টে ছাপ পড়ার পর অমল এগিয়ে গেল অফিসারের সামনে। তিনি ভিসা এবং যাওয়ার স্ট্যাম্প দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি গতকাল পৌঁছে আবার গতকালই চলে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। একদিনের জন্য গিয়েছিলাম।"

"কোনও কোম্পানি?"

"মানে? আমি একাই গিয়েছিলাম!" অমল বলল।

রহস্যজনক হাসি হেসে পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মারলেন অফিসার।

রিজুলা দাঁড়িয়েছিল বিশাল বড় হল ঘরে ঢোকার মুখে। সেখানে পৌঁছতেই মনে পড়ল মিস্টার আহমেদের নির্দেশ। বলেছিলেন, প্লেন থেকে বের হওয়ার আগে একটা ফোন করে নিতে। এখন একটু দেরি হয়ে গেলেও মোবাইল বের করে সুইচ অন করে দেখল ধীরে-ধীরে ওটা চালু হল। তখনই খেয়াল হল, সে তো বিশেষ কাজে বাইরে যায়নি। এত রাতে মিস্টার আহমেদকে ফোন করলে তিনি রেগে যাবেন না তো!

"কাকে ফোন করছ?" রিজুলা জিজ্ঞেস করল।

"কাউকে না। তোমার সুটকেস কোথায় পাওয়া যাবে?"

"ওই যে, লোকগুলো ভিড় করে আছে যে বেল্টের সামনে, সেখানে আসবে। কিন্তু তুমি কি ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কিছু কিনতে চাও? ওখানে আছে।"

"কী কিনব?"

"যা ইচ্ছে। মদ, সিগারেট, পারফিউম।"

"শাড়ি, মানে জামদানি শাড়ি পাওয়া যাবে?"

শব্দ করে হাসল রিজুলা, "তোমার মাথা সত্যি খারাপ? কেউ কখনও ডিউটি-ফ্রি শপে শাড়ি খুঁজতে যায়? কিন্তু কার জন্য কিনবে? প্রেমিকা?"

"দুর, বউদি আনতে বলেছিল।"

"ও। যদি ঢাকায় যাও এনে দিও। তুমি এক কাজ করো। ওখানে ভাল পারফিউম পাবে, ওঁর জন্য কিনে নিয়ে যেতে পার," রিজুলা বলল।

অমলের খেয়াল হল, মিস্টার আহমেদ তাকে দু'হাজার ভাট দিয়েছিলেন। তার অনেকটাই পকেটে পড়ে আছে। এগুলো ভদ্রলোককে ফেরত দিতে হবে। না দিলে কী সে খরচ হল, তার হিসেব দাখিল করতে হবে। সেখানে পারফিউমের দাম দেখলে ভদ্রলোকের কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে। সে মাথা নাড়ল, "না, থাক।"

বেল্ট চালু হল। যেসব প্যাসেঞ্জার লাগেজ চেক ইনে দিয়েছিলেন, তাঁরা অপেক্ষা করছেন নিজেরটা পাওয়ার জন্য। প্রথমেই বড়-বড় পিচবোর্ডের পেটিগুলো দেখা দিল। অমল অবাক হয়ে দেখল, সেই ছেলেগুলো পটাপট বেল্ট থেকে তুলে ট্রলিতে চাপাচ্ছে সেগুলো। তার নজরে পড়ল, এখন প্রত্যেকের গলায় লাল অথবা সাদা মাফলার জড়ানো। যাওয়ার সময় অথবা ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে ওরা মাফলার জড়ায়নি।

পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক বিড়বিড় করলেন, "ওদের মাল তো আগে আসবেই। দেশের কী অবস্থা!"

অমল কিছু বলল না। সে বুঝতে পারল, এই 'ওদের' কথা নিত্যযাত্রীরা জানেন এবং ভাল চোখে দেখেন না। এবার সুটকেসগুলোর আসা শুরু হল। অমলের মনে হচ্ছিল, সব সুটকেস একইরকম! এক সাইজ, এক রঙের সুটকেস হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে যাত্রীরা নিজেরটা চিনে নিচ্ছে, তা ওর কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল!

তারপর বেল্ট থেমে গেল। রিজুলার সুটকেস আসেনি। কিন্তু আরও অনেক যাত্রী হতাশমুখে দাঁড়িয়ে। মিনিটখানেকের মধ্যেই বেল্ট আবার চালু হতেই রিজুলা চেঁচিয়ে উঠল, "ওই যে, আমারটা!"

অমল সাহায্য করল সুটকেসটাকে বেল্ট থেকে তুলে ট্রলিতে রাখতে। সঙ্গে-সঙ্গে নিচু হয়ে সুটকেসের তালার খাঁজে ঢোকানো বাঁধন খুলতে চেষ্টা করে হতাশ হল রিজুলা। বলল, "এটা খুলুন তো।"

"এখানে খুলছ কেন?"

"বা রে! ওই ব্যাগটা বের করে আপনাকে দেব তো!"

অমল চারপাশে তাকাল। এই হলঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইউনিফর্ম পরা মানুষগুলোকে দেখে নিয়ে বলল, "এখানে না খুলে বাইরে গিয়ে খুললে ভাল হয়।"

"কেন?"

"তুমি সুটকেস খুললে সবাই তাকাবে।"

"তাতে কী হবে?"

"রিজুলা, আমি জানি না, ওর ভিতরে কী আছে!"

একটু ভাবল রিজুলা, "তা হলে আপনি ট্রলিটা ঠেলে এগোন।"

"আশ্চর্য! তোমার সুটকেস আমি নিয়ে যাব কেন?"

"সুটকেসে যেটা আছে, সেটা তো আপনাকেই দেওয়া হয়েছে," রিজুলা বলল, "ওটা যখন বের করে হাতে নেবে না, তখন তোমার সুটকেসটাই ট্রলিতে ঠেলে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

চারপাশে তাকাল অমল। ইতিমধ্যে যারা সুটকেস পেয়ে গিয়েছে তারা ট্রলি নিয়ে 'কাস্টমস' লেখা গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই যাচ্ছে, গ্রিন চ্যানেলের দিকে, রেড চ্যানেল ফাঁকা।

বাধ্য হয়ে ট্রলি ঠেলে সুটকেস নিয়ে এগিয়ে চলল অমল, পাশে রিজুলা। ইমিগ্রেশন অফিসারকে দেওয়া ফর্মের একটা টুকরো পাসপোর্টের মধ্যে ছিল, সেটা নিয়ে কাস্টমস অফিসার বললেন, "ব্যাঙ্কক থেকে আসছেন তো!"

অমল মাথা নাড়ল "হ্যাঁ।"

"কিছু ডিক্লেয়ার করার থাকলে রেড চ্যানেলে চলে যান।"

"মানে?"

"ভারতে নিয়ে আসা অবৈধ এমন জিনিস সঙ্গে থাকলে আপনি রেড চ্যানেলে গিয়ে ডিক্লেয়ার করুন। তাতে পেনাল্টি এবং পানিশমেন্ট কম হবে।"

অমল রিজুলার দিকে তাকাল। রিজুলা পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, "অফিসার, আমরা কোনও অবৈধ জিনিস নিয়ে আসিনি।"

"সুটকেসটা কার?"

অমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "ওর।"

রিজুলার দিকে তাকিয়ে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি নিজের হাতে প্যাক করেছেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে খেপে গেল রিজুলা, "আমার সুটকেস অন্য লোকে কেন প্যাক করবে? আমাদের দেখে কি আপনার ওই ক্যারিয়ারদের মতো মনে হচ্ছে?"

কাস্টমস অফিসার বললেন, "আমার কী মনে হচ্ছে, তার কৈফিয়ত চাইছেন কেন? আপনার সুটকেসে ব্যাঙ্ককে চক দিয়ে যে চিহ্ন এঁকেছে, তার অর্থ হল ওর ভিতরে সন্দেহজনক কিছু থাকতে পারে। ওটা খুলুন, প্লিজ়।"

রিজুলার গলা আরও উপরে উঠল, "নিশ্চয়ই খুলব। কিন্তু তার আগে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। একটু আগে ১০-১২জন ক্যারিয়ার ছেলে অবৈধ মালের পেটি নিয়ে এখান দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওদের কেন আটকালেন না? কেন ওদের পেটি খুলতে বললেন না? প্লেনে বসে ওরা বলাবলি করছিল, আপনারা ওদের কিছুই বলবেন না। চোখের সামনে সেটাই সত্যি হতে দেখলাম। জবাব দিন!"

অফিসার বেশ হকচকিয়ে গেলেন।

আর একজন অফিসারের গলা ভেসে এল, "লেট দেম গো।"

কাস্টমস অফিসার সরে দাঁড়াতেই ওরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। বাঁ-দিকে টাকা ভাঙানোর কাউন্টার, তার পাশে প্রি-পেড ট্যাক্সির বুথ।

রিজুলা বলল, "আমাকে উল্টোডাঙ্গা পর্যন্ত একটা ট্যাক্সি বুক করে দেবেন?

"আমি শোভাবাজার যাব, তোমাকে উল্টোডাঙ্গায় নামিয়ে যেতে পারি।"

"বাঃ, তা হলে খুব ভাল হয়।"

প্রি-পেড বুথে লোক দাঁড়িয়ে থাকায় মিনিটআটেক সময় লাগল। পকেটে দু'শো কুড়ি টাকা ছিল, তাই ভাট ভাঙাতে হল না। ট্যাক্সির জন্য স্লিপটা নিয়ে সামনে হাঁটলে অমল রিজুলাকে দেখতে পেল না। ওই ঢাউস সুটকেস ট্রলিতে চাপিয়ে কি ও বাইরে বেরিয়ে গেল?

এই মাঝরাতেও এয়ারপোর্টের বাইরে ছোটখাটো জটলা। রিজুলাকে দেখতে পাচ্ছিল না অমল। ইতিমধ্যেই ট্যাক্সি লাগবে কিনা, ডলার আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন ঘিরে ধরেছিল অমলকে। তাদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে চারপাশে তাকিয়ে রিজুলাকে যখন দেখতে পেল না, তখন অমলের মেরুদণ্ড কনকন করে উঠল! ওই সুটকেসে চামড়ার ব্যাগটা আছে। মিস্টার হকের লোক নিশ্চয়ই এখন এসে তার কাছে ব্যাগটা চাইবে। তাকে ট্যাক্সি বুক করতে বলে কোথায় চলে গেল রিজুলা?

অমলের মনে হল, রিজুলা নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে। এতক্ষণ ধরে সে ওর সঙ্গে থেকে সন্দেহজনক কিছুই দেখেনি। ওই ব্যাগে মহামূল্যবান কিছু আছে কিনা, তা সে যেমন জানে না, রিজুলারও তা জানা নেই। তাই ওটা হাতানোর লোভে রিজুলা পালিয়ে যাবে, এটা ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু রিজুলা যে নেই, এটা তো সত্যি। সে এগিয়ে গিয়ে একজন সরল চেহারার দালালকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাই, একজন অল্পবয়সি মেয়ে বিরাট সুটকেস নিয়ে একটু আগে বেরিয়ে এসেছিল। সে কোথায় কোন দিকে গিয়েছে তা দেখেছেন?"

লোকটি মাথা নাড়ল, "ট্রলি ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"রামুয়ার ট্যাক্সিতে মাল তুলে বেরিয়ে গিয়েছে," লোকটি বলল।

"কোথায় গিয়েছে?"

"বলল, উল্টোডাঙ্গায় যাবে। রামুয়া ওকে মুরগি করল তিনশো চেয়ে।"

সন্দেহের আর অবকাশ নেই। তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে রিজুলা!

সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "রামুয়া কি আবার এখানে আসবে?"

"না। প্যাসেঞ্জার নামিয়ে গ্যারেজ করে দেবে।"

"ওর গ্যারেজ কোথায়?"

"শোভাবাজার রাজবাড়ির পাশে। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো?"

"কিছু না।"

অমল প্রি-পেড ট্যাক্সির লাইনের দিকে এগোচ্ছিল। কিন্তু তার আগে একটা লোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ঈদ মুবারক!"

চমকে তাকাল অমল! লোকটি আরও তিনবার 'ঈদ মুবারক' বলে জিজ্ঞেস করল, "কাস্টমস কী বলছিল?"

"সুটকেসে কেন নিয়ে এসেছেন?"
"হকসাহেব তাই বলেছিলেন।
"সুটকেস খুলেছিল ওরা?"
"না, যে মেয়েটার সুটকেস, সে খুলতে দেয়নি।"
"যাক! মালটা কোথায়?"
"ওটা ওই সুটকেসেই থেকে গিয়েছে।"
"সুটকেস কোথায়?"
"এই হয়েছে মুশকিল! আমি প্রি পেড ট্যাক্সির লাইনে ছিলাম। ওই মেয়েটি ট্রলিতে সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে আসে। বাইরে এসে দেখতে পাচ্ছি না।"
"এসব গল্প বানিয়ে কোনও লাভ নেই ব্রাদার।"
"বিশ্বাস করুন, আমি গল্প বানাচ্ছি না।"
"মেয়েটা আপনার কে হয়?"
"কেউ না।"
"আরে! কেউ হয় না, এমন মেয়ের সুটকেসে মালটা রাখলেন?"
"আমার তো সুটকেস ছিল না। ওকে আমার ভাল মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। হকসাহেবও ওকে দেখেছেন।"
"আচ্ছা! এই মেয়েটাই আপনার গার্লফ্রেন্ড। কেউ হয় না বলছেন কেন?"
"সত্যি, ওকে কালকের আগে আমি দেখিনি। হকসাহেবকে ও নিজেই আমার গার্লফ্রেন্ড বলে পরিচয় দিয়েছিল।"
"কিন্তু ওর সঙ্গে কি আর কেউ ছিল?"
"না, থাকার কোনও সুযোগ নেই। ও এয়ারপোর্টে এসে টিকিট কাটে।"
"আপনি ওকে টিকিট কাটতে দেখেছেন?"
"না," হকচকিয়ে গেল অমল, "ও একাই কাটতে গিয়েছিল।"
"কলকাতায় ও কোথায় থাকে? ফোন নম্বর কত?"
"উল্টোডাঙ্গায় থাকে। নম্বর জানি না। মানে, জানতে চাইনি।"
"আপনি আদমি না পায়জামা। একটা মেয়ের সঙ্গে গোটা দিন লটপট করলেন, অথচ তার কোনও ঠিকানা জানলেন না?"
লোকটার কথায় লজ্জিত হল অমল। রিজুলা তার মোবাইল নম্বর নিয়েছে, কিন্তু তার যে কেন নেওয়ার আগ্রহ হয়নি...হয়তো নম্বর জানতে চাইলে ভুল নম্বর বলত।
"লুক মিস্টার, ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করুন," লোকটি বলল।
"আমি বুঝতে পারছি না, কোথায় খুঁজব! আচ্ছা, আমাকে আপনি চিনলেন কী করে?" অমলের এতক্ষণে কথাটা খেয়ালে এল।
"আপনার ছবি পেয়েছি ই-মেলে। মেয়েটার ছবিও ওতে আছে। কিন্তু শুধু ছবি দেখে কলকাতা শহর থেকে কোনও মেয়েকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কীভাবে মেয়েটাকে খুঁজে বের করবেন, তা আপনাকেই ঠিক করতে হবে," লোকটা গম্ভীর হল।
"ও বলেছিল, উল্টোডাঙ্গায় থাকবে..." অমল বলল।
"উল্টোডাঙ্গা? মিথ্যে বলেছে। কী নাম?"
"রিজুলা।"
"আঃ, টাইটেল কী?"
"জানি না, মানে, জানতে চাইনি।"
"অমলবাবু, আপনি খুব বিপদে পড়েছেন। ওই ব্যাগ না পেলে আপনার বেঁচে থাকা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আপনি কোথায় থাকেন?"
"শোভাবাজার," অমলের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।
"এখন ব্যাঙ্ককে অনেক রাত। বসকে ফোন করতে হবে ভোরের পর। আপনি আমার সঙ্গে চলুন," লোকটা বলল, "আমার নাম রফিক।"
"কোথায় যাব?"
"যতক্ষণ না বসের অর্ডার পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবেন। পালানোর চেষ্টা করবেন না। আপনার ঠিকানা পেতে বসের পাঁচ মিনিটও লাগবে না।" লোকটা এগোতেই অমল হাতের রসিদটা দেখল।
বাঁ দিকে পার্ক করা একটা গাড়িতে রফিক তাকে নিয়ে উঠতেই মনে পড়ে গেল দালালটার কথা। সে বলল, "রিজুলা উল্টোডাঙ্গায় গিয়েছে।"
"এখনও বিশ্বাস করছেন?"
"হ্যাঁ। কারণ, আমি বেরিয়ে এসে ওর খোঁজ করতে এক ট্যাক্সির দালাল বলেছে, ও উল্টোডাঙ্গায় যাওয়ার জন্য রামুয়ার ট্যাক্সিতে উঠেছে।"
"তা হলে তো খোঁজ করতে হবে রামুয়া কোথায় থাকে।"
"শোভাবাজার রাজবাড়ির পাশে ওর গ্যারেজ।"
"গুড! এটুকু জানার জন্য ধন্যবাদ।"
ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। ভিআইপি রোড ধরে সোজা উল্টোডাঙ্গার মোড়ে পৌঁছে রফিক বলল, "এই হল আপনার উল্টোডাঙ্গা। এর কোন বাড়িতে আপনার গার্লফ্রেন্ড আশ্রয় নিয়েছে, তা জানেন?"
"না, সত্যি বলছি, জানি না।"
রফিক ড্রাইভারকে বলল, "শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনে চলো।"
শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন থেকে অমলের বাড়ি হাঁটাপথে পাঁচ মিনিট। সে একটু স্বস্তি পেল।
রফিক জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটা ব্যাঙ্ককে কী করত?"
"একটা স্টোরে চাকরি করত।"
"কলকাতার মেয়ে ব্যাঙ্ককের দোকানে চাকরি করতে গিয়েছে? দূর! আপনাকে ঢপ মেরেছে! নিশ্চয়ই সেক্স ওয়ার্কার ছিল। অথবা স্মাগলিং বিজনেসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। বিপদ বুঝে দেশে চলে এসেছে। আসার সময় আপনার মতো একজন বুদ্ধকে পেয়ে মুরগি করেছে।" রফিক মাথা নাড়ল।
কথাটা একটুও ভাল লাগল না অমলের। এত কাণ্ডের পরও সে রিজুলাকে খারাপ ভাবতে পারছে না। অন্তত সেক্স ওয়ার্কার তো নয়ই।
প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল রফিক, "বসের উচিত হয়নি এত বড় রিস্ক নেওয়া। আমাকে এখন ঝাড় খেতে হবে।"
"কেন?" অমল তাকাল।
"ওই মেয়েটার ছবি তো আপনার সঙ্গে ছিল। বস জানতে চাইবে, মেয়েটা যখন একা বেরিয়ে এল, তখন আমি ওকে চিনতে পারলাম না কেন?"
অমল বলল, "আমার মনে হয়, ওকে আমরা ভুল ভাবছি। এমন হতে পারে, রিজুলা কোনও পরিচিত লোককে দেখে তাকে এড়ানোর জন্য তড়িঘড়ি ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে! মানে, এরকম তো হতেই পারে।"
হঠাৎ ঘুরে বসল রফিক, "কী ব্যাপার বলুন তো? মালটা মেয়েটার হাত দিয়ে পাচার করে নিজে সাধু সাজছেন? পরে ভাগ করে নেবেন? ওসব চিন্তা ছাড়ুন। পঞ্চাশ লাখ টাকা বস সহজে ছেড়ে দেবে না।"
"অ্যাঁ? ওর মধ্যে পঞ্চাশ লাখ টাকা ছিল?" চমকে উঠল অমল।
"কী ছিল, তা কি বস আপনাকে বলেছে?"
"না।"
"তা হলে কিছুই ছিল না! শোভাবাজারের মেট্রো এসে গিয়েছে। গ্যারেজটা কোন দিকে, চটপট বলুন," রফিক বলল।
"জয়পুরিয়া কলেজের সামনে দিয়ে একটু এগোলেই বাঁ হাতে। কাছেই শোভাবাজার রাজবাড়ি," অমল হাত তুলে দেখাল।
গ্যারেজের গেট বন্ধ। গাড়ি থেকে নেমে রফিক বলল, "চুপচাপ বসে থাকুন। পালানোর চেষ্টা করবেন না। অ্যাই, ওর উপর নজর রাখিস!" ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে গ্যারেজের দরজায় শব্দ করতে লাগল রফিক।
বারচারেক শব্দ হওয়ার পরে ভিতর থেকে সাড়া এল, "কে? কে?"
"গেট খোল!" রফিক চেঁচাল।"
"গ্যারেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"
"কথা বলব, মাল পাবে!"
একটু পরে খালি গায়ে লুঙ্গি পরা এক প্রৌঢ় দরজা খুলল।
রফিক পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরল, "রামুয়া ট্যাক্সি গ্যারেজ করে চলে গিয়েছে?"
"হ্যাঁ বাবু। একটু আগে এসেছিল।"
রফিক নোটটা নাচাল লোকটার নাকের সামনে, "কোথায় থাকে ও?"
"পাশের বস্তিতে।"
"ডেকে আনো, ডাবল দেব!" পঞ্চাশ টাকা হাতছাড়া করল রফিক।
"এত রাতে?" লোকটা দ্বিধায় পড়ল।
"দু'মিনিটের ব্যাপার।"
"গ্যারেজ খোলা রেখে কী করে যাব?"
"তালা দিয়ে যাও।"
লোকটা রফিকের মুখের দিকে তাকাল, গাড়িটা দেখল। তারপর ভিতর থেকে তালা-চাবি নিয়ে এসে কড়ায় লাগিয়ে বাঁ-দিকে চলে গেল।
ফিরে এল রফিক গাড়ির কাছে, "তা হলে একটা সত্যি বলেছেন।"
"মানে?"
"ওই যে রামুয়ার নাম, এই গ্যারেজটার কথা। আপনি ম্যারেড?"
"না, না।"
"ম্যারেড হলে এই হাল হত না। মেয়েটার সঙ্গে শুয়েছেন?"
"না।" সোজা হয়ে বসল অমল।
"দূর মশাই! আপনার ব্যাঙ্ককে যাওয়াই উচিত হয়নি!" রফিক বলল।
এখন রাত প্রায় তিনটে। চারধার শুনশান। রাস্তার আলোগুলো এখন

হলদেটে দেখাচ্ছে। অমল জানে, আর ঘন্টাখানেক পরে এই রাস্তায় লোক হাঁটতে শুরু করবে। গঙ্গাস্নানে যাবে অনেকেই। তারপর শুরু হবে মর্নিং ওয়াকারদের মিছিল। অনেকদিন পর কলকাতার এই চেহারা দেখছে সে।

মিনিটআটেক পরে গ্যারেজের সেই প্রৌঢ় মোটাসোটা একটা লোককে নিয়ে এল, যার উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, নীচে খাকি প্যান্ট।

কাছে আসতেই রফিক বলল, "সরি ভাই, সারাদিন খেটে যেই বডি কাত করেছেন, তখনই ইনি আপনাকে ডেকে আনলেন। খুব বিপদে পড়ে আসতে হল। আপনি তো এখন এয়ারপোর্ট থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে এলেন রামুয়াবাবু!"

রামুয়া বলল, "তো?"

"আরে আমার এই ভাইয়ের সুটকেসের সঙ্গে একজন মেয়েছেলের সুটকেস সেমসাইড হয়ে গিয়েছে। ওরটা তিনি ভুল করে নিয়ে গিয়েছেন। এখন বেচারার জামাকাপড় সব ওই সুটকেসে। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই।" পকেট থেকে দু'টো একশ টাকার নোট বের করে রামুয়াকে দিল রফিক।

"ওঃ, কাল সকালে এলে কি অসুবিধে হত?" টাকা নিল রামুয়া।

"কাল ভোরের ট্রেনে ও বাইরে যাবে। আর ঘন্টাতিনেক বাকি," রফিক হাসল, "না হলে এই সময় আসতাম না।"

"ওকে উল্টোডাঙ্গায় হাউজিংয়ে নামিয়েছি।"

"কত নম্বর?"

"হাউজিয়ের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে গিয়েছে। কত নম্বর বাড়িতে ঢুকছে দেখতে হলে আমাকে ওর পিছন-পিছন যেতে হত।"

রফিক জিভ দিয়ে আফসোসের শব্দ বের করল, "ওদের কি একটাই গেট? আমি কখনও যাইনি। মনে করে দেখুন।"

"হ্যাঁ। একদিকে তো একটাই মেন গেট। ভিতরে অনেকগুলো চার তলা বাড়ি। ওগুলোর একটাতেই থাকে নিশ্চয়ই। চলি, আর দাঁড়াতে পারছি না।"

রফিক গাড়িতে উঠে বলল, "এখন ওখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই। আপনি তো শোভাবাজারে থাকেন। কোথায়?"

"কাছেই।"

"ড্রাইভারকে বলে দিন।"

অমল রাস্তা বলে দিলে গাড়ি বাড়ির সামনে চলে এল। পাড়া নিস্তব্ধ। কোনও বাড়িতে আলো জ্বলছে না।

"কোন বাড়ি?"

"সামনেরটা।"

"গিয়ে বেল টিপুন। আর কাল সকাল সাড়ে সাতটায় ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যান," রফিক যেন বিরক্ত হয়েই বলল।

এই সময় কখনও বাড়িতে ফেরেনি অমল। সে নিজেকে বোঝাল, বিদেশ থেকে ফেরার সময় যদি ফ্লাইট দেরিতে পৌঁছাত, তা হলে তার কিছু করার থাকত না। সে এগিয়ে গিয়ে বেল বাজাতেই সমস্ত পাড়াটা যেন ঝমঝমিয়ে উঠল। অমল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ রফিক তাকে লক্ষ করছে। সে নিজের বাড়িতে ঢুকছে কিনা জেনে, তবে এখান থেকে যাবে। দ্বিতীয়বার বেল বাজানোর পরে দাদার গলা শোনা গেল, "কে? কে?"

অমল বলল, "দাদা, আমি।"

দরজা খুলল দাদা। খালি গা, পরনে পায়জামা, "তুই?"

"ফ্লাইট খুব লেট করেছে।"

"ও। এত রাতে রিস্ক নিয়ে কেন এলি? ভোরের আলো ফুটলে আসা উচিত ছিল। ভিতরে আয়," দাদা সরে দাঁড়াল।

অমল দেখল গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

দাদা জিজ্ঞেস করল, "কার গাড়ি?"

"এক ভদ্রলোক লিফ্ট দিলেন।"

"কী আশ্চর্য! অজানা,অচেনা লোকের গাড়িতে এত রাতে তুই উঠলি? চারধারে যা হচ্ছে, তা কাগজে পড়িস না?"

দাদা দরজা বন্ধ করতেই বউদি এগিয়ে এসে বলল, "আঃ, আসামাত্র বকাঝকা শুরু করলে। যাও ভাই, হাতমুখ ধুয়ে নাও। কিছু খাবে?"

"না," অমল দ্রুত নিজের ঘরে চলে এসে জামাটা খুলল। তারপর বাথরুমে ঢোকামাত্র মোবাইলের রিং শুনতে পেল। দ্রুত বেরিয়ে এসে টেবিল থেকে ওটা তুলে নিয়ে অচেনা নাম্বার দেখে চাপা গলায় বলল, "হ্যালো!"

ওপাশ থেকে নিচু গলা ভেসে এল, "অমল, আমি রিজুলা।"

অমল বেশ উত্তেজিত হয়ে বলতে গেল, "কী আশ্চর্য..."

রিজুলা তাকে থামিয়ে দিল, "চুপ। পরে সব বলব। শোনো, আমি উল্টোডাঙ্গার মাসিমার বাড়িতে উঠিনি। কাল সকাল ন'টায় তোমাকে ফোন করব। গুড নাইট!" লাইন কেটে দিল রিজুলা।

হকচকিয়ে গেল অমল। হঠাৎ তার খেয়াল হল, রিজুলা তাকে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে! দ্রুত ওই নম্বরে ফোন করতেই শুনতে পেল, 'সুইচড অফ।'

মেয়েটা সত্যিই রহস্যময়! মিনিটপাঁচেক পর বিছানায় শুয়ে অমলের মনে হল, রিজুলা তাকে ইচ্ছে করে এড়িয়ে যায়নি। গেলে, এই ফোনটা কখনই করত না। এখন ওর নম্বর সে পেয়ে গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, খুব বিপদের মধ্যে আছে সে। মেয়েটার জন্যে খুব মায়া হতে লাগল অমলের।

ঘুম ভাঙল মায়ের হাতের ঠেলায়। কোনওরকমে চোখ মেলতেই মা বলল, "শুনলাম, ভোর রাতে ফিরেছিস। ওষুধ খেয়ে ঘুমাই বলে টের পাইনি। এখন একটা লোক তোকে ডাকছে। বলছে, খুব জরুরি দরকার।"

"কে লোক?" চোখ মেলতে চাইছিল না অমল।

"কোনওদিন দেখিনি। নাম বলল, রফিক।"

শোনামাত্র ইলেকট্রিক শক খেল যেন! লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। টেবিলের ঘড়ি বলছে এখন সাতটা পঁয়ত্রিশ।

দ্রুত তৈরি হতে না-হতেই বউদি চা নিয়ে এল।

"চা খাওয়ার সময় নেই!" অবাক হয়ে যাওয়া বউদির পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই গাড়িটাকে দেখতে পেল। তাকে দেখে দরজা খুলে দিল রফিক, "আপনার টাইম সেন্স চমৎকার।"

"সরি।"

"উল্টোডাঙ্গা হাউজিংয়ে চলো," ড্রাইভারকে বলল রফিক। তারপর পকেট থেকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে বলল, "এই হল আপনার বান্ধবী।"

সে দেখল, তার আর রিজুলার ছবি। এটা কখন তুলল? কে তুলল? নিজেই উত্তর অনুমান করল, নিশ্চয়ই হকসাহেবের অফিসে ক্যামেরা ছিল।

মাঝখান থেকে কাগজটাকে ছিঁড়ে ছবি দুটো আলাদা করল রফিক, "আপনারা আলাদা হয়ে গেলেন! এখন এই মেয়েটার একলা ছবি দেখলে লোকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। ওর বাড়িতে গিয়ে আপনি সরাসরি ব্যাগটা চাইবেন। আপনাকে বস দিয়েছিল, আপনি ওর কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। ভালভাবে ফেরত দিলে কিছু বলার নেই।"

"যদি ভালভাবে ফেরত না দেয়?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"জোর করে আদায় করবেন!"

"আমি?"

"নিশ্চয়ই! আপনার উপর দায়িত্ব ছিল ওটা নিয়ে এসে আমাকে দেওয়ার। ভয় পাবেন না, আমি তো সঙ্গে আছি," রফিক হাসল।

এই যাওয়াটা যে কোনও কাজের হবে না, তা যদি সে বলতে পারত তা হলে রফিক কী করত? তার চেয়ে এখন অভিনয় করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে বলল, "আপনার জন্য সকালে চা খাওয়া হল না।"

রফিক বলল, "ব্যাগটা উদ্ধার করুন, তারপর একটা গোটা চা-বাগানের চা আমি আপনাকে খাইয়ে দেব!"

আর কথা বাড়াল না অমল।

উল্টোডাঙ্গার বিরাট হাউজিং কমপ্লেক্সের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালে রফিক জিজ্ঞেস করল, "বলুন, কোন বাড়িতে আপনার বান্ধবী থাকে?"

"আমি তো কখনওই আসিনি, কী করে বলব?" অমল অবাক হল।

"এখনও মিথ্যে বলে যাচ্ছেন। একসঙ্গে ব্যাঙ্ককে ফুর্তি করলেন, দামি জিনিস বুঝে বান্ধবীকে দিয়ে পাচার করালেন আর তার বাড়ি জানেন না?"

"ও আমার বান্ধবী নয়। ওখানে হঠাৎ আলাপ হয়েছিল। আর যদি আমি জানতে পারতাম, ব্যাগটার মধ্যে অত দামি জিনিস আছে, তা হলে হয় আনতাম না, নয় ওকে রাখতে দিতাম না," অমল বলল।

রফিক গাড়ি থেকে নামল। এক ভদ্রলোক লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে বাজারের ব্যাগ হাতে বেরচ্ছিলেন, তাঁর সামনে গিয়ে বলল, "নমস্কার, আপনি কি এই হাউজিংয়ে থাকেন?"

ভদ্রলোক নীরবে মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বললেন।

বুক পকেট থেকে রিজুলার ছবি বের করে রফিক ভদ্রলোকের সামনে ধরল, "এই মেয়েটিকে কি চেনেন? এ এখানেই থাকে।"

কিছুক্ষণ লক্ষ করে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "না ভাই, দেখিনি।"

"একটু মনে করে দেখুন।"

"না ভাই। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন," ভদ্রলোক চলে গেলেন।

রফিক অমলকে ডাকল, "আরে। গাড়িতে বসে না থেকে আসুন না।"

অমল নামল।

রফিক বলল, "এই হাউজিংয়ের নিশ্চয়ই একজন কেয়ারটেকার আছে। তার কাছে চলুন।"

ওরা ভিতরে ঢুকল। দু'পাশে চার তলা বাড়ি, প্রতি তলায় দু'টো করে ফ্ল্যাট। একজন ভদ্রমহিলা, বেশ বৃদ্ধা, পায়ে কেডস, হাতে লাঠি, বেশ দ্রুত হাঁটছিলেন। রফিক তাঁকে থামিয়ে ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, তিনি চেনেন কিনা।

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছবিটা ফেরত দিয়ে জানতে চাইলেন, "কী করেছে সে? আপনারা কেন খোঁজ করছেন?"

"উনি ব্যাঙ্কক থেকে কাল রাতে ফিরেছেন। আমার দাদা ওঁর হাতে গিফ্ট পাঠিয়েছেন, কিন্তু এই হাউজিং ছাড়া ঠিকানা বলেননি। এই মেয়েটি তাঁকে বলেছিল, এখানকার সকলে তাকে চেনে। আমরা গিফ্ট নিতে এসেছি।" অম্লানবদনে মিথ্যে বলে গেল রফিক।

"এই মেয়েটি এখানে থাকে না," বৃদ্ধা বললেন।

"থাকে না?"

"আরতি, আরতি মিত্র, ওই যে ওই বাড়ির একতলার ফ্ল্যাট, ও চারটে মেয়েকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে রাখত, এখনও রাখে। এই মেয়েটি কিছুদিন গেস্ট হিসেবে ছিল। কিছু ছেলের সঙ্গে ঝামেলা হওয়ায় আরতি ওকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে সব জানতে পারবেন," বৃদ্ধা চলে গেলেন।

অমলের মনে হল, প্রতি পাড়ায় কিছু বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা থাকেন, যাঁরা অন্যের ব্যাপারে জানতে খুব উৎসুক। ইনিও তাঁদের একজন। কিন্তু রফিক ছাড়ার পাত্র নয়। হন-হন করে এগিয়ে গিয়ে গ্রিলের ভিতর থেকে তালা দেওয়া ফ্ল্যাটের কলিং বেলের বোতাম টিপল।

একজন মধ্যবয়সি, বেশ স্বাস্থ্যবতী মহিলা দরজা খুললেন, "কী চাই?"

"নমস্কার," রফিক বলল, "আপনার এখানে রিজুলা থাকেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল মহিলার, "এ খবর কোথায় পেলেন?"

"ওর খোঁজ করছিলাম। একজন বৃদ্ধা লাঠি হাতে মর্নিংওয়াক করছিলেন, তিনি বললেন, রিজুলা আপনার এখানে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকে।"

"শকুনি বুড়ি!" চাপা গলায় বলেই স্বর চড়ালেন মহিলা, "থাকে না, থাকত। সেটা এখানকার সবাই জানে। আমি তাকে একটা কারণে আর রাখিনি।"

অমল শুনছিল, প্রশ্ন করল, "কারণটা কী?"

"এখানকার দু'টো ছেলে নাকি ওর পিছনে লেগেছিল। কার দোষ, জানি না। আমার এখানে যে মেয়ে থাকবে, তাকে নিয়ে কোনও ঝামেলা হোক আমি চাই না," ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "তাকে কী দরকার?"

উত্তর না দিয়ে রফিক জিজ্ঞেস করল, "উনি এখন কোথায় আছেন?"

"ব্যারাকপুরে ওদের বাড়ি। ঠিকানাটা বলেছিল। এখন মনে নেই। নিশ্চয়ই কোথাও পেয়িং গেস্ট হিসেবে আছে।"

"ব্যারাকপুরের কোন অঞ্চলে?"

ভদ্রমহিলা এবার মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "চন্দন, চন্দন-চন্দনপুর, না ওরকম কোনও পাড়া।"

রফিক বিরক্ত হল, "একজন আপনার কাছে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিল অথচ তার পরিচয়-ঠিকানা লিখে রাখেননি, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তা ছাড়া আমাদের কাছে খবর আছে, কাল অনেক রাতে রিজুলা ট্যাক্সি নিয়ে এখানে এসেছিল। ওর সঙ্গে মালপত্র ছিল। এখানে আপনার বাড়ি ছাড়া আর কোনখানে সে উঠতে পারে?"

"রিজুলা কাল রাতে এখানে এসেছিল?" ভদ্রমহিলা চোখ কপালে তুললেন।

"আপনার এখানে সে আসেনি?"

"কী বলছেন আপনি?" ভদ্রমহিলা চিৎকার করলেন।

"তা হলে এখানকার কোন ফ্ল্যাটে সে যেতে পারে?"

"আমি জানি না। সে যখন আমার এখানে ছিল, তখন কারও সঙ্গে মিশতে দেখিনি। আমাকে দয়া করে বিরক্ত করবেন না। নমস্কার!" দরজা বন্ধ করে দিলেন ভদ্রমহিলা।

রফিক ঘুরে দাঁড়াল, "ট্যাক্সিওয়ালা লোকটা নিশ্চয়ই মিথ্যে বলেনি। ওর কোনও ইন্টারেস্ট নেই যে মিথ্যে বলবে। অত রাতে ওই বয়সের কোনও মেয়ে..." বলে থেমে গেল সে, "ওর সঙ্গে কি খুব ছোট ব্যাগ ছিল?"

"না, বেশ বড় সুটকেস!" সত্যি কথা বলল অমল।

"অবিশ্বাস্য ব্যাপার! বড় স্যুটকেস ক্যারি করে কোথায় যেতে পারে সে?" খিঁচিয়ে উঠল রফিক, "তখন থেকে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে একদিন সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বের করে ব্যাগটা যদি উদ্ধার না করেন, তা হলে কাল আপনার বডি মর্গে থাকবে! চলুন।"

গাড়ির কাছে ফিরে এসে রফিক বলল, "এত বড় হাউজিং, কোন ফ্ল্যাটে সে ঘাপটি মেরে আছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অত রাতে সে যখন এখানেই নেমেছে তখন বড় স্যুটকেস নিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না। আপনি খুঁজুন, প্রতিটি ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিন।"

অমল বলল, "আশ্চর্য! সেটা কখনও সম্ভব? ও তো ব্যারাকপুরে চলে যেতে পারে। ভদ্রমহিলা তো বললেন, চন্দনপুরে ওর বাড়ি।"

"আপনি কি বুদ্ধু! ব্যারাকপুরে যেতে হলে সে এখানে ঢুকবে কেন? তা ছাড়া চন্দনপুর জায়গাটা কোথায়, তা আপনি জানেন?"

রফিক প্রশ্ন করামাত্র তার গাড়ির ড্রাইভার বলল, "রফিকভাই, ব্যারাকপুরে চন্দনপুর নামে কোনও জায়গা নেই, আছে চন্দনপুকুর!"

"অ্যাঁ! থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি গিয়েছ?"

"হ্যাঁ, ট্রেনে গিয়েছিলাম। স্টেশনের ওপাশে আনন্দপুরী থেকে রিকশা নিয়ে যেতে হয়। কল্যাণীর মোড়ে যে রাস্তা গিয়েছে, সেই রাস্তায় প্রথমে পড়বে চন্দনপুকুর বাজার, তারপর বটতলা। এলাকাটা বেশ বড়," ড্রাইভার বলল।

"যত বড়ই হোক, একবার যেতে হবে," অমলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল রফিক, "আপনার মোবাইলে আমার নম্বর নোট করে নিন," নাম্বার বলল সে। অমল সেটা সেভ করে নিলে রফিক বলল, "কাল সকাল আটটার মধ্যে ফোন না পেলে প্রথমে আপনার কোম্পানিকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, আপনি ওদের পয়সায় ব্যাঙ্ককে গিয়ে অন্য কোম্পানির কাজ করার জন্য টাকা নিয়েছেন। দুই, টাকা নিয়ে মাল গায়েব করেছেন! তিন, তার জন্য এই লাইনে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তাই আপনাকে দেওয়া হচ্ছে!" কথাগুলো শেষ করে রফিক গাড়িতে উঠে বেশ জোরে দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে বলল, "ব্যারাকপুরে চলো।"

চোখের সামনে থেকে গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র অমলের মোবাইল বেজে উঠল। সে নম্বর দেখতে গিয়ে নাম পড়ল। যন্ত্রটাকে অন করে হ্যালো বলতেই সোহাগের গলা শুনতে পেল, "ও মা! তুমি কলকাতায় ফিরে এসেছ তবু ফোন করোনি কেন?"

"কাল অনেক রাতে ফিরেছি। বাড়িতে ঢুকেছি রাত তিনটের সময়। তাই ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছে। সরি!"

"অ্যাই, সরি বলবে না। আমারই উচিত ছিল আরও পরে ফোন করা। আর একটু ঘুমতে পারতে," সোহাগ বলল।

"না, না। এখন ঠিক আছি। তুমি কেমন আছ?"

"ভাল। তুমি এসে গিয়েছ জানার পরে আরও ভাল!" হাসল সোহাগ, "কেমন ঘুরলে? কাজ হল?"

"হ্যাঁ," মিথ্যে বলা ছাড়া উপায় নেই অমলের।

"আমার মনে হচ্ছে, তোমার আরও কিছুক্ষণ ঘুমনো উচিত। তুমি আরও খানিকটা ঘুমাও। তারপর ফোন কোরো," সোহাগের গলা স্নেহজড়ানো।

"আচ্ছা!" ফোন বন্ধ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল অমল।

সোহাগকে মিথ্যে কথা বলতে খুব খারাপ লাগে ওর। কিন্তু সত্যি কথা বললেই সোহাগ উত্তেজিত হয়ে যাবে! কোনও অন্যায়, কোনও অসৎ কাজ সোহাগ মেনে নিতে পারে না। শুনলেই উত্তেজনার কারণে ওর নাক বা কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। আবার অসুস্থতা বেড়ে যাবে। এই ঘটনা তার জন্যে ঘটুক, তা কখনই চায় না অমল। এখন মিথ্যে বলা মানে সোহাগকে সুস্থ রাখা।

অমল বুঝতে পারে, সোহাগ তাকে ভালবাসে। ভাল না বাসলে তার কথা ভাবত না। সে শহরে আছে জানলে আনন্দিত হত না! কিন্তু সোহাগের ভালবাসা আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে একদম আলাদা। ও কোনও আশা করে না। ভালবাসার মানুষকে নিয়ে জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখে না। ওর রক্তে যে বিষ ঢুকেছে তা কোনও দিন দূর হবে না বোঝার পর নিজেকে আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ত করে ফেলেছে! নির্লিপ্ত, অথচ অমলের ব্যাপারে সবসময় ভাল খবর পেতে উৎসাহী! এই সোহাগকে সে কী করে জানাবে যে, সে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে! কোনও দোষ না করেই শাস্তি পেতে হবে তাকে।

তারপরই মনে হল, দোষ তারও ছিল। কেন সে মিস্টার হকের প্রস্তাব জানার পর ব্যাগটাকে নিয়ে আসতে রাজি হল? ওই ব্যাগে কী আছে জানতে চাইলে ভদ্রলোক যেভাবে রি-অ্যাক্ট করেছিলেন, তাতেই বোঝা গিয়েছিল যা

আছে, তা মোটেই বৈধ নয়। কিন্তু তখন রিজুলা আগ বাড়িয়ে যখন মিস্টার হককে সন্তুষ্ট করল, তখন কেন সে মেনে নিল? রিজুলার স্বার্থ ছিল। টাকা পেয়ে সে ফেরার টিকিট কিনতে পেরেছে। সেই টাকা রিজুলা ফেরত দেবে বলেছিল, কিন্তু সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য ছিল? জেনেশুনে সে ফাঁদে পা দিয়েছিল! তবে হ্যাঁ, ব্যাগটা রিজুলার সুটকেসে না দিয়ে সে যদি দমদমে নিয়ে আসত, তা হলে তাকে কত বছর জেলে বাস করতে হত, কে জানে! নিশ্চয়ই কাগজে বেরত, দমদমে কাস্টমসের হাতে যুবক গ্রেফতার! ব্যাগে কী ছিল, তা-ও ছাপা হত। আর সেই খবর পড়ার পর সোহাগের যে প্রতিক্রিয়া হত, তা কল্পনা করতে পারছে না অমল! রিজুলা যেভাবে ওটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, তাতে অন্তত একটা বড় বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছে সে!

কিন্তু এখন কী উপায়? আজ সকালে মিস্টার আহমেদের সঙ্গে তার দেখা করার কথা। দেখা করে কী বলবে সে? এই ব্যাপারটা না জানালেও ওঁরা যে জানতে পারবেন না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কাল সকালের মধ্যে তাকে ব্যাগটা উদ্ধার করতেই হবে। এ ছাড়া বাঁচার কোনও রাস্তা নেই। রিজুলা বলেছিল, আজ সকাল ন'টায় তাকে ফোন করবে। এখন ঘড়িতে ন'টা দশ। যে নম্বর থেকে ফোনটা এসেছিল, সেই নম্বর ডায়াল করল অমল। তৎক্ষণাৎ কানে এল, ওর ফোন সুইচড অফ করে রাখা আছে।

নিজের অজান্তে বেশ বড় শ্বাস নিল অমল। যতক্ষণ না রিজুলা তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে, ততক্ষণ কিছু করার নেই। যদি অমল আর ফোন না করে, যদি ব্যাগের সম্পদ হাওয়া করে কোথাও উধাও হয়ে যায়, তা হলে সব শেষ হয়ে যাবে তার! আগামীকাল সকালের পর এই কলকাতার কোনও নির্জন জায়গায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকবে! ভাবতেই কেঁপে উঠল সে।

উল্টোডাঙ্গা স্টেশনের সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এক ভাঁড় চা খেতে-খেতে অমল মোবাইলে সময় দেখল। এখন বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া শেষ করে খিদিরপুরে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। খালি পেটে চা খেতেই শরীর গুলিয়ে উঠছিল। সে ঠিক করল, স্নান-খাওয়া চুলোয় যাক, মিস্টার আহমেদের সঙ্গে দেখা করে আসাটাই জরুরি। ধর্মতলার বাস ধরার জন্য এগিয়ে গেল অমল। যেসব বাস এয়ারপোর্টের দিক থেকে আসছে, তাদের পাদানিতেও মানুষ ঝুলছে! ওই বাসে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ওদিকে শেয়ার ট্যাক্সির জন্য লাইন পড়েছে। সেই লাইনের শেষে দাঁড়াল সে। পিছনে ইতিমধ্যে লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হঠাৎ তার পিছনের লোকটি বলল, "ও ভাই, পকেটে যে মোবাইল বাজছে!" দ্রুত মোবাইলটা বের করে বোতাম টিপে হ্যালো বলতেই রিজুলার গলা কানে এল, "ওঃ। তিনবার বেজে-বেজে থেমে গেল! তুমি কি কানে কম শোনো?"

"সরি, এত আওয়াজ যে শুনতে পাইনি।" অমল দ্রুত কথা বলল।

"তুমি এখন কোথায়?"

"উল্টোডাঙ্গায়।"

"খুব ভাল। তুমি এখনই সল্ট লেকে চলে এসো।"

"সল্ট লেকে?" অবাক হল অমল।

"কোয়ালিটির উল্টো দিকের গলিতে ঢুকে সোজা খালের দিকে চলে আসবে। এলে একটা বড় রাস্তা পাবে, যেটা খালের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। ওই রাস্তায় পৌঁছে আমাকে ফোন করবে। আমি অপেক্ষা করছি," লাইন কেটে দিল রিজুলা।

যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল অমল! মেয়েটা অবশ্যই খারাপ নয়। নইলে তাকে ফোন করত না। ওর কাছে গিয়ে, দরকার হলে হাতে-পায়ে ধরে, ব্যাগটা চেয়ে নিতে হবে। ওটা রফিককে দিয়ে দিলে এযাত্রায় বেঁচে যাবে সে। নিজেকে বেশ হাল্কা লাগছিল এখন। তারপরই মনে হল রিজুলার সঙ্গে দেখা করে ব্যাগটা নিতে তো বেশ কিছুটা সময় চলে যাবে। মিস্টার আহমেদকে যদি জানিয়ে দেয় সে দুপুরের দিকে যাবে তা হলে...সে মোবাইলের বোতাম টিপে-টিপে নম্বর বের করে চাপ দিল। মিস্টার আহমেদের মোবাইল বাজছে। তারপর তাঁর গলা কানে এল।

"স্যার, আমি অমল।"

"ওয়েলকাম, এতক্ষণ ঘুমচ্ছিলে?" মিস্টার আহমেদের গলার স্বর গম্ভীর।

"কাল অনেক রাতে ফিরেছি।"

"জানি। শোনো, আমি এখন বেরচ্ছি। তুমি বিকেল চারটের মধ্যে দেখা কোরো। আর হ্যাঁ, তৈরি হয়ে এসো, তোমাকে আজ রাতেই বাইরে যেতে হতে পারে," মিস্টার আহমেদ ফোন রেখে দিলেন।

শোনামাত্র একরাশ ক্লান্তি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল অমলের উপরে। এখনও শরীর ঘুম চাইছে। দুটো রাত একটা দিন একফোঁটা বিশ্রাম হয়নি। আবার আজ রাতে বাইরে যেতে হয় তা হলে...সে চোখ বন্ধ করল।

"আরে, ভাই এগিয়ে যান," পিছনের লোকটা বিরক্ত হল।

তৎক্ষণাৎ লাইন থেকে বেরিয়ে এল অমল।

জনাচারেক মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে শেষ পর্যন্ত রিজুলার বলা রাস্তার মোড়ে পৌঁছল অমল। এখন রোদ বেশ চড়া। সল্ট লেকের এদিকের মানুষ সম্ভবত এই রোদে বাড়ি থেকে বের হয় না। অমল রিজুলার নম্বর ডায়াল করল। মোবাইল বাজছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রিজুলার গলা তার পিছন থেকে ভেসে এল, "ওটা বন্ধ করো।"

তাড়াতাড়ি বন্ধ করল অমল।

রিজুলা বলল, "আজ ভোরে ওই বাড়িতে এসেছি আমি। বাড়িটা আমার বান্ধবীর দাদুর। আমাকে পছন্দ করেন উনি। ব্যাঙ্কক যাওয়ার আগে আমি ওঁর কাছেই কয়েক মাস ছিলাম।"

"কিন্তু তুমি তো কাল এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিতে উল্টোডাঙ্গা হাউজিংয়ে গিয়েছিলে! ভোর অবধি কোথায় ছিলে?"

"উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে!"

"সে কী! কেন?"

"এয়ারপোর্টে যাকে দেখে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিলাম, তোমাকে বলার সময় পাইনি, সেই লোকটা আমাকে ফলো করবে বলে মনে হচ্ছিল। তাই তাকে এড়াতে হাউজিংয়ে ঢুকেছিলাম। ওই জায়গাটা আমার চেনা। কিছুক্ষণ থাকার পর যখন বুঝলাম, কেউ আমার খোঁজে ওখানে যায়নি, তখন স্টেশনে চলে গিয়েছিলাম।"

"ওই সুটকেস বইতে পেরেছিলে?"

"বোকার মতো প্রশ্ন! না হলে গেলাম কী করে?"

"স্টেশনে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না?"

"করেছে। বলেছি, মাঝরাতে ট্রেন থেকে নেমে ট্যাক্সিতে যেতে ভয় করছিল বলে থেকে গিয়েছি," হাসল রিজুলা, "দু'জন রেলের পুলিশ আমাকে পাহারা দিয়েছে! ভোর হলে ওদের একজন ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছে।"

"এয়ারপোর্টে দেখা লোকটাকে এত ভয় পেলে কেন?"

"তোমাকে সব কথা বলতে আমি বাধ্য নই।"

"বেশ। এবার দয়া করে ব্যাগটা ফেরত দাও।"

"এসো আমার সঙ্গে।"

রিজুলাকে অনুসরণ করে যে বাড়িতে অমল ঢুকল, তার ভিতরে যাওয়ার দুটো দরজা আছে। মূল দরজা দিয়ে না গিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে ওটাকে বন্ধ করল রিজুলা। বোঝাই যাচ্ছে, অমলের কাছে যাওয়ার সময় ওটা খুলে গিয়েছিল সে। ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ চোখের এক বিঘত দূরত্বে কাগজ রেখে পড়ার চেষ্টা করছিলেন। পরনে গেঞ্জি আর পায়জামা।

রিজুলা বলল, "দাদু, প্রণাম করো।"

হকচকিয়ে গেল অমল। বৃদ্ধ কাগজ নামিয়ে তাকাতেই সে বাধ্য হল পায়ে হাত দিতে।

বৃদ্ধ বললেন, "থাক, থাক। এর কথাই বলছিলে?"

"হ্যাঁ দাদু," রিজুলা বলল।

"বাঃ, তুমিও ব্যাঙ্ককে ব্যবসা করছ শুনলাম। কী ব্যবসা?"

রিজুলা বলল, "টুরিজম। কলকাতায় যেমন বিভিন্ন ট্র্যাভেল এজেন্সি টুরিস্টদের বেড়াতে নিয়ে যায়, তেমনই ও-ও ওখানে এজেন্সি খুলেছে। সমস্ত তাইল্যান্ড ঘুরিয়ে দেখায়।"

"বাঃ, চমৎকার! আমার যা শরীরের অবস্থা, উপায় নেই যে, তোমাকে বলব আমাকে ঘুরিয়ে দেখাও! ছেলে থাকে কানাডায়। সেখানেই বাড়ি-ঘর করেছে। ওর মা যখন মারা গিয়েছিল, তখন খবর পেয়ে এসেছিল। তার মেয়ে রিজুর বান্ধবী। সে এখান থেকেই স্কুলের পরীক্ষা দিয়েছিল। তারপর বাবা-মায়ের সঙ্গে কানাডায়। আমি পড়ে আছি এখানে, কাজের মেয়ের উপর ভরসা করে!" বৃদ্ধ বললেন।

রিজুলা বলল, "এখন তো চিন্তা নেই, আমি এসে গিয়েছি।"

"ক'দিন! কান টানলেই মাথা ছুটে যাবে ব্যাঙ্ককে!" তারপর অমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা এবারেই বিয়েটা সেরে ফিরবে নাকি?"

"আঃ দাদু, মাত্র তো মাসদু'য়েকের আলাপ। আরও কিছুদিন যাক।" রিজুলা বলতেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীর কাঁপছিল, একটু সামলে বললেন, "আমার স্নানের সময় হয়ে গিয়েছে। তোমরা এখানেই বসে গল্প

করো।"

বৃদ্ধ চলে যেতেই একটি কাজের প্রৌঢ়া মুখ বাড়াল, "দিদি চা দেব?"

রিজুলা তাকাল অমলের দিকে।

অমল বলল, "যদি অসুবিধে না হয়..." সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি তার। কিন্তু খাবার চাইতে লজ্জা হল। চেয়ার টেনে বসার পরে অমল জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখন কী করবে?"

"এখনও ভাবিনি।"

"ও, তা ব্যাগটা..."

"ব্যাগটার জন্য ছটফট করছ কেন?"

অমল একটু ভাবল। তারপর ঠিক করল, রিজুলাকে সব কথা খুলে বলাই ভাল। এখন পর্যন্ত রিজুলা তাকে ঠকায়নি।

সে রিজুলার দিকে তাকিয়ে বলল, "শোনো, আমি খুব বিপদে পড়েছি।"

"কী হয়েছে?" রিজুলার কপালে ভাঁজ পড়ল।

"তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, মিস্টার হক বলেছিলেন দমদম এয়ারপোর্টে ওঁর লোক এসে একটা কথা তিনবার বললেই যেন আমি ব্যাগটা ওকে দিয়ে দিই! মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

অমল ঘটনাগুলো যতটা সম্ভব সংক্ষেপে রিজুলাকে বলল। শোনার পর মাথা নাড়ল রিজুলা, "তোমরা মিসেস মিত্রের বাড়িতে আমার খোঁজে গিয়েছিলে? কী সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ। একজন বৃদ্ধা রফিককে বলেছিলেন, তোমার খবর ওখানে গেলে জানা যাবে। সেখানে গিয়ে জানা গেল, তোমার আসল বাড়ি ব্যারাকপুরে। মিসেস মিত্র চন্দনপুর বলেছিলেন। ওটা চন্দনপুকুর অনুমান করে রফিক সেখানে চলে গিয়েছে। আমাকে শাসিয়েছে, আগামীকাল সকালের মধ্যে যদি ব্যাগ ফেরত না দিই, তা হলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি ব্যাগটা দাও, আমি ওটা রফিককে দিয়ে ঝামেলামুক্ত হই!"

চা এসে গেল। কাপটা অমলের সামনে এগিয়ে দিয়ে রিজুলা বলল, "আমাকে তোমার কী মনে হয়?"

"মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে, তুমি আমার ক্ষতি করবে না। আবার তোমার স্বচ্ছন্দে মিথ্যে কথা বলার অভ্যেসটা আমার ভাল লাগছে না!"

"কী মিথ্যে বলেছি আমি?"

"তুমি আমায় বলেছিলে ব্যারাকপুরে ভাইয়ের বাড়ি যাবে না, এখানে মাসির বাড়ি যাবে। যাওনি।"

"মিসেস মিত্রকে আমি মাসিমা বলতাম। ওখানে গিয়ে মনে হল, যদি কেউ আমার খোঁজ করে, তা হলে মিসেস মিত্রের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। তাই এখানে এসেছি। আর দাদুকে তোমার সম্পর্কে যা বলেছি, তা যদি না বলতাম, তা হলে তুমি এখানে বসে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতে না। কিন্তু যে ব্যাগ নিয়ে ওরা এত ব্যস্ত হচ্ছে তার ভিতরে কী আছে?" রিজুলা জিজ্ঞেস করল। তারপর নিজেই উত্তর দিল, "তুমি বা আমি জানি না। তুমি মিস্টার হককে জিজ্ঞেস করতেই তিনি রেগে গিয়েছিলেন।"

"যাই থাকুক..."

"দাঁড়াও," হাত তুলে অমলকে থামাল রিজুলা, "ওই ব্যাগ ওদের পাওয়ার কথা নয়। ব্যাগের ভিতর অবৈধ কিছু থাকলে এয়ারপোর্ট কাস্টমস সিজ করে আমাকে জেলে ঢোকাত। কারণ, ওটা আমার সুটকেসে ছিল। তোমাকে হয়তো কিছুই বলত না। তুমি যদি বলতে আমার সঙ্গে প্লেনে আলাপ হয়েছে, তখন স্বচ্ছন্দে ছাড়া পেয়ে যেতে। ঠিক কিনা?"

নীরবে মাথা নাড়ল অমল।

"তোমাকে চেনেন না। হয়তো একজনের রেফারেন্সে তুমি ওঁর কাছে গিয়েছিলে, আমার তো তা-ও ছিল না, মিস্টার হক এরকম দু'জনকে কোন বিশ্বাসে অত্যন্ত দামি অথচ অবৈধ কিছু ব্যাগে ভরে ভারতে নিয়ে আসতে বলবেন? এই নিয়ে আসার জন্য তিনি আট হাজার টাকাও দিয়েছিলেন। তুমি ওঁর কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্য, বলো?" রিজুলা জিজ্ঞেস করল।

অমল বলল, "আমি যাদের কাছে কাজ করছি, তাদের একজনের রেফারেন্স থাকায় বোধ হয় বিশ্বাস করেছিলেন।"

"তুমি ওঁর কর্মচারী নও। তোমার জেল হলে ওঁর কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, ওই ব্যাগে যা রয়েছে, তা কাস্টমস বাজেয়াপ্ত করলে ওঁর কোনও ক্ষতি হবে না জেনেই তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন," রিজুলা বলল।

"বেশ তো। ব্যাগটা খুলে দেখলেই সেটা বোঝা যাবে!" অমল বলল।

"ব্যাগ যে খোলা হয়েছে, তা ওরা বুঝলে তোমার অসুবিধে হবে না?" রিজুলা জিজ্ঞেস করল।

অমল অবাক হল। ব্যাগটার চেহারা মনে করে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু খুলবে কী করে?"

"কেন?"

"তুমি বোধ হয় লক্ষ করোনি। ওই ব্যাগে কোনও জিপ নেই, খোলার ব্যবস্থাও নেই। পুরোটাই চামড়ায় মোড়া!" অমল বলল।

"নিশ্চয়ই একটা লুকানো ব্যবস্থা আছে..."

"বোধ হয় নেই। তুমি হাতে নিয়ে দ্যাখোনি?"

"সময় পেলাম কোথায়! সুটকেসেই পড়ে আছে।"

"নিয়ে এসো তো!"

রিজুলা উঠে দাঁড়াল, "আমি জানি, তুমি এই ব্যাগটার জন্যেই আমার কাছে এসেছ। ব্যাগ পেয়ে গেলে আর যোগাযোগ রাখবে না!" অদ্ভুত হাসি ওর ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

মিনিটদু'য়েক পর সেই ব্যাগটা নিয়ে ফিরে এল রিজুলা। চারপাশ দেখে নিয়ে বলল, "সত্যি তো, খোলার কোনও জায়গাই নেই!"

"দেখি," হাত বাড়িয়ে ব্যাগ নিয়ে মাথা নাড়ল অমল, "অথচ ভিতরে অনেক কিছু আছে। ঢোকাল কী করে?"

"মুখ খুলে ঢুকিয়ে আবার সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। ওই ভাঁজটা লক্ষ করো, সেলাই একটু আলাদা।" রিজুলা বলল।

"ঠিক বলেছ! এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। যাদের জিনিস, তাদের দিয়ে মুক্ত হই!" অমল বলল।

মাথা নাড়ল রিজুলা, "তুমি ভুল করছ। আমি যখন ব্যাগটা ঝুঁকি নিয়ে এ দেশে এসেছি, তখন আমার ইচ্ছের উপর ফেরত দেওয়া নির্ভর করছে।"

"তার মানে? রফিককে না দিলে আমার কী হবে, তা বুঝতে পারছ না?"

"পারছি। কিন্তু দেওয়ার আগে আমি দেখতে চাই ওর ভিতরে কী আছে!

"খুললেই বোঝা যাবে..."

"একটু আগে তো তাই বললাম। দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবে!" হাত বাড়িয়ে ব্যাগ তুলে নিয়ে চোখের সামনে সেলাইটা ধরল রিজুলা, "আঃ, ধরতে পারবে না। এই পাড়ার ফুটপাথে বসে যে লোকটা জুতো সেলাই করে, তাকে দিলে সে আবার এইরকম সেলাই করে দেবে।"

"রিজুলা, খুব রিস্ক হয়ে যাচ্ছে!" অমল ভয় পেল।

"তা যদি বলো, তো সেটা ব্যাঙ্কক থেকেই শুরু হয়েছিল! কিন্তু আমি দেখতে চাই, কী এমন জিনিস এর ভিতরে আছে, যার জন্য মিস্টার হকের লোক উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে, তোমাকে শাসাচ্ছে!" রিজুলা বলল।

"কীভাবে দেখবে?"

রিজুলা বাঁ দিকে তাকাল। ওদিকেই গিয়েছেন বৃদ্ধ। স্নান শেষ হলেই তিনি নিশ্চয়ই এখানে আসবেন। রিজুলা বলল, "আমার ঘরে চলো।"

"কিন্তু উনি তো আমাদের এখানেই বসতে বললেন!"

"আঃ! একটু সাহসী হও তো। দাদু দোতলায় উঠতে পারেন না। এসো।"

রিজুলাকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠে অমল দেখল, গোটাতিনেক বড় ঘর রয়েছে। তার একটায় ঢুকে রিজুলা বলল, "বোসো।"

চেয়ার টেনে বসে অমল রিজুলার সুটকেসটা দেখতে পেল। হ্যান্ডেলে এয়ারলাইন্সের ট্যাগ ঝুলছে। মোড়ক থেকে ব্লেড বের করে সন্তর্পণে সেলাই কাটতে লাগল রিজুলা। প্রায় তিন ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেলে ব্লেড রেখে আঙুল ঢুকিয়ে ভিতরের জিনিস বের করার চেষ্টা করে মাথা নাড়ল, "বেরচ্ছে না!"

"কী আছে?" শ্বাস চেপে জিজ্ঞেস করল অমল।

"পাতলা কাগজ, না, প্লাস্টিকের শিটের মতো মনে হচ্ছে!" আঙুল বের করে সে বাকিটা কেটে ফেলল।

অমল চেঁচিয়ে উঠল, "এ কী করলে?"

রিজুলা হাসল, "তিন ইঞ্চি সেলাই করলে যা হবে, পুরোটাতে তফাত হবে না। বরং দু'টো আলাদা সেলাই নয় বলে কেউ বুঝতে পারবে না!"

এবার হাত ঢুকিয়ে প্লাস্টিকে মোড়া প্যাকেট বের করে নিয়ে এল রিজুলা। প্লাস্টিকের নীচে ব্রাউন রঙের কাগজের খামে যা রাখা আছে, তা দেখতে হলে ওগুলো খুলতে হবে। যেহেতু প্যাকেট সিল করা নেই, তাই বের করতে অসুবিধে হল না। অমল অবাক হয়ে দেখল, হাজার টাকার বেশ কয়েকটা বান্ডিল! প্রতিটি বান্ডিলে ব্যাঙ্কের মতো কাগজ আটকানো!

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রিজুলা গুনল, "পঞ্চাশটা! তার মানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এত টাকা মিস্টার হক একজন অচেনা লোকের হাত দিয়ে পাঠাবেন কেন?"

ঢোঁক গিলল অমল, "উ-উনি, মিস্টার আহমেদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন!"

"বলেছিলেন, তবু..."

"রেখে দাও, যেমন ছিল, তেমনই রেখে দাও।"

"এই টাকাগুলো কাস্টমস সিজ করে নিতে পারত।"

"কিন্তু তা তো করতে পারেনি।"

"পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নিয়ে আসার জন্য মিস্টার হক মাত্র আট হাজার খরচ করেছেন। টেন পার্সেন্ট হলে পাঁচ লক্ষ টাকা হয়!" রিজুলা একটা বান্ডিল তুলে নিয়ে বলল, "আমরা এর থেকে পাঁচ লক্ষ নিয়ে নিতেই পারি। তোমার আড়াই, আমার আড়াই। ঠিক আছে?"

"কিন্তু গোনার পর ওরা তো জানতেই পারবে।"

"ঠিক যেমন ছিল, তেমনই ফেরত দিয়ে দেবে। আমরা ব্যাগ খুলিনি যদি বোঝে, তা হলে বুঝবে ভিতরে কী আছে, তা আমাদের জানা নেই," রিজুলা পাঁচ লক্ষ টাকা সরিয়ে বাকিগুলো যেমন ছিল, তেমনভাবে ব্যাগে রাখল। তারপর বলল, "বেশি দেরি করলে লোকটা উঠে যাবে। চলো, সেলাই করিয়ে আনি। একটা বান্ডিল থেকে পঞ্চাশটা নোট আলাদা কর, প্লিজ।"

অমল যন্ত্রের মতো কাজটা করে মুখ তুলল, "এত টাকা আমি কোথায় রাখব!"

"আড়াই লাখ টাকা রাখার জায়গা পাচ্ছ না? অদ্ভুত!" রিজুলা বিরক্ত হল। দুটো বড় খাম নিয়ে এসে টাকাগুলো আলাদা করে তাদের ভিতর ঢুকিয়ে একটা এগিয়ে দিল অমলের দিকে, "দয়া করে ওটা পকেটে ঢোকাও।"

হাত কাঁপছিল অমলের! এত টাকা সে কোনওদিন স্পর্শ করেনি! প্রায় চোরের ভঙ্গিতে প্যাকেটটা পকেটে ঢুকিয়ে দেখল প্যান্টের খানিকটা উঁচু হয়ে আছে। রিজুলা নিজের অংশটা সুটকেসে রেখে একটু ভাবল। তারপর বান্ডিল থেকে একটা এক হাজার টাকার নোট বের করে নিয়ে সুটকেসে তালা দিয়ে দিল, "চলো।"

"সেলাই করার সময় যদি লোকটা টাকাগুলো দেখতে পায়?" অমলের গলার স্বর বেশ শুকনো, পা ঝিমঝিম করছে।

"কী করে দেখবে? ব্রাউন কাগজ, প্লাস্টিকের আড়ালে যা আছে তা কি লোকটা খুলবে বলে ভাবছ? তুমি সত্যি ভিতু সম্প্রদায়ের লোক।" বলে হাসল রিজুলা, "এটা ভালই হয়েছে।"

"মানে?" অমল স্বাভাবিক হচ্ছিল।

"দু'জনেই চালাক হলে পার্টনারশিপ হত না, এ-ওকে টক্কর দিতাম। চলো," একটা পার্স টেবিল থেকে নিয়ে তার ভিতরে হাজার টাকার নোটটা রেখে রিজুলা বাইরে পা বাড়াল।

ডাইনিং টেবিলে বৃদ্ধ বসেছিলেন। তাঁর পাশে গিয়ে রিজুলা বলল, "দাদু, একটু ব্যাঙ্কে যেতে হবে। এখনই ফিরব।"

"এই রোদে বেরবে? ঠিক আছে!" মাথা নেড়েই বোধ হয় বৃদ্ধের মনে পড়ে গেল, "আমার চশমাটা সারাতে দিয়েছিলাম। বাড়ি এসে অর্ডার নিয়ে গেল, কিন্তু ঠিক সময়ে দিয়ে গেল না। ওই ব্যাঙ্কের পাশেই দোকান। মোড়ের ব্যাঙ্ক তো?"

"হ্যাঁ।"

"দাঁড়াও, তোমাকে টাকাটা এনে দিই, দু'শো লাগবে!"

বৃদ্ধ ওঠার চেষ্টা করতেই রিজুলা আপত্তি করল, "আপনাকে এখন টাকা দিতে হবে না। আমি তো ব্যাঙ্কে যাচ্ছি, নিয়ে আসব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ!" বৃদ্ধ যেন স্বস্তি পেলেন।

বাড়ির বাইরে পা দিয়ে রিজুলা বলল, "ব্যাগটাকে সাবধানে ধরো। ছেলেদের হাতেই এই ব্যাগটা স্বাভাবিক লাগবে।"

ব্যাগটা সন্তর্পণে নিল অমল। এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা আছে ভাবতেই শ্বাস অনিয়মিত হল।

হাঁটতে-হাঁটতে রিজুলা বলল, "শোনো, পাড়ার লোকের কাছে সেলাই করাতে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।"

"কেন?"

"আমরা যখন লোকটাকে বলব পুরোটা সেলাই করে দিতে, তখন ও নিশ্চয়ই অবাক হবে! ভিতরের জিনিস বের করার জায়গা না রেখে কেউ তো এরকম সেলাই করতে ওকে বলবে না...সেলাই করে দিয়ে অন্য লোকের কাছে গল্প করবে নির্ঘাত। পাড়ায় লোকের মনে কৌতূহল তৈরি করার কোনও দরকার নেই। তার চেয়ে বৈশাখীর মোড়ে চল, ওখানে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব।"

রিজুলার কথা শুনে অমল খুশি হল। মেয়েটা যে খুব বুদ্ধিমতী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রতিটা পা ফেলার আগে ও যথেষ্ট ভেবে নেয়। কিন্তু তার সঙ্গে এখনও কোনও প্রতারণা করেনি। এই যে তার পকেটে এখন আড়াই লক্ষ টাকা রয়েছে, তা রিজুলার জন্যই সম্ভব হয়েছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ না করে যদি রিজুলা ব্যাগটা খুলত, তা হলে নিজেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যেত!

কোয়ালিটির সামনে থেকে আধ খালি অটো পেয়ে রিজুলার সঙ্গে বৈশাখীর মোড়ে পৌঁছে গেল অমল। এখন খাঁ-খাঁ দুপুর। রাস্তায় লোকজন হাতে গোনা। একটা গাছতলায় ছাতিমাথায় বসে জুতো সেলাই করছিল যে লোকটা তার কাছে গিয়ে রিজুলা বলল, "এই ব্যাগটা দিল্লিতে পাঠাব। ভাল করে সেলাই করে দিও তো।"

লোকটি বিহারি এবং বেশ বয়স্ক। চোখের চশমার একটা কাচ প্রায় সাদা। ব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে হিন্দিতে বলল, "সেলাই কোথায় হবে?"

"ওই যে, সাইডে, পিছনের দিকে যেরকম সেলাই আছে, সেই রকম।"

"দিদি, ওই সেলাই মেশিনে করা, ওরকম কী করে করব?"

"চেষ্টা করুন, কাছাকাছি করতে।"

"কতটা করব?"

"পুরোটা। একটুও ফাঁক যেন না থাকে।"

লোকটা মুখ তুলে রিজুলাকে দেখল, "তা হলে ভিতরের জিনিস বের করবেন কী করে? তার জন্য তো জায়গা রাখতে হবে।"

"হবে না। যাদের পাঠাব, তারা এভাবেই চাইছে।"

লোকটা বিড়বিড় করলেও অমল শুনতে পেল, "কত কী দেখব!" অন্য সেলাইয়ের চামড়ার সঙ্গে মিলিয়ে লোকটা যখন সেলাইয়ের আয়োজন করছিল, ঠিক তখনই অমলের মোবাইল বেজে উঠল।

রিজুলা বলল, "দ্যাখো, ওরা ব্যারাকপুর থেকে কিছু আবিষ্কার করে এল কিনা!" বলে লোকটার কাজ মন দিয়ে দেখতে লাগল।

ঢোঁক গিলল অমল। দু'পা সরে গিয়ে ফোন অন করে বলল, "হ্যালো!"

"তুমি এখন কোথায়?" সোহাগের গলা।

"রাস্তায়," বলেই যোগ করল, "একটু পরে খিদিরপুরে যাব।"

"আমার কিছুই ভাল লাগছে না।" সোহাগের গলার স্বর ভিজে।

"কেন? কী হয়েছে?" উদ্বিগ্ন হল অমল।

"জানি না। কিছুই জানি না। সকাল থেকে মনে হচ্ছে, আমার জন্য কোনও খারাপ খবর আসছে!" সোহাগ বলল।

"দূর, এসব ভেবো না।"

"আমি কী ভাবছি? আপনা থেকেই মনে আসছে। একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম তোমাকে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ। তুমি একটা বিরাট গভীর অন্ধকারে ঢাকা কুয়োর দিকে এগিয়ে যাচ্ছ! আমি কত ডাকলাম, কিন্তু তুমি শুনতেই পেলে না। কুয়োর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। শরীর কেমন করছে!"

"তোমার মা কোথায়?" গলা কেঁপে গেল অমলের।

"মা ডাক্তারকে ফোন করছে।"

"প্লিজ সোহাগ, তুমি এসব ভেবো না। শান্ত হও।"

"তুমি ঠিক আছ তো?" অন্যরকম শোনাল সোহাগের গলার স্বর।

"ঠিক আছি, ঠিক আছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, রাখছি।"

মোবাইল থেকে সোহাগের নাম্বার মুছে গেলেও সম্বিৎ ফিরল না অমলের। সোহাগ তো একদম ঠিকঠাক স্বপ্ন দেখেছে! এক গভীর কালো কুয়োর দিকে এগিয়ে চলেছে সে। কিন্তু এই স্বপ্ন সোহাগ দেখল কী করে? অমলের মনে হল, সে যেন কোথাও পড়েছিল, স্নেহ-ভালবাসার বোধ তীব্র হলে অনেকেই প্রিয়জনের অমঙ্গল অনুমান করতে পারে।

"কী হল?"

রিজুলার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল অমল। সে মাথা নাড়ল, কিছু না।

"ফোনে কথা বলতে-বলতে তুমি তো নিজের মধ্যে ছিলে না?"

"না, না। হয়ে গিয়েছে?" এগিয়ে এল অমল।

"ওদের ফোন ছিল?"

"না, আমার এক বন্ধু ফোন করেছিল।"

রিজুলা আবার লোকটির কাজ দেখতে লাগল। সেলাই শেষ করে মোমজাতীয় কিছু দিয়ে ঘষল সে। তারপর রিজুলার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "দেখুন দিদি, ঠিক আছে তো?"

সেলাই দেখে হাসল রিজুলা। আপাত চোখে উল্টো দিকের সেলাইয়ের সঙ্গে তফাত খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কত দেব?"

"বিশ টাকা দিন।"

অমল প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে হাত তুলে থামিয়ে পার্স বের করে কুড়ি টাকার নোট দিয়ে দিল রিজুলা। তারপর ব্যাগটাকে অমলের হাতে তুলে দিয়ে রিকশা ডাকল।

"রিকশায় যাবে?" অমলের মনে হল, অটোতে গেলে তাড়াতাড়ি ফেরা যাবে। রিজুলাকে নামিয়ে দিয়ে ব্যাগ নিয়ে উল্টোডাঙায় চলে যেতে পারবে।

ততক্ষণে রিকশাওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করে রিকশায় উঠে রিজুলা বলল,

"উঠে এসো। দাদুর বাড়িতে গিয়ে স্নান করে খেয়ে বেরিও। সকাল থেকে চা ছাড়া আর কিছু খেয়েছ?"

"না," রিকশায় উঠল অমল, "বাড়িতে ভাববে।"

"ফোন করে দাও," রিজুলা বলল, "কে-কে আছে বাড়িতে।"

"মা, দাদা-বউদি," অমল বলল, "এই যে তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, দাদু তো অসন্তুষ্ট হতে পারেন। আমাকে তিনি চেনেন না..."

মুখ ফেরাল রিজুলা, "আচ্ছা, তুমি সবসময় এত ভাব কেন? এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলে কখনও সামনে যেতে পারবে? ফোনটা করো।"

এই দুপুরেও রিকশায় বসে বাতাস পাচ্ছিল অমল। বউদি রিসিভার তুলল। গলা শুনে চেঁচাল, "তুমি কোথায়? সেই যে সকালে একটা লোকের সঙ্গে চা না খেয়ে বেরিয়ে গেলে, মা খুব চিন্তা করছে।"

"কাজে আছি, ঠিক আছি। শোন বউদি, আমার জন্য দুপুরে খাবার রেখো না। আমার ফিরতে দেরি হবে," অমল বলল।

"ও বাবা! তবু কী ভাগ্য খবরটা ফোন করে জানালে। এত কাজ করছ, তোমার কী হল গো? রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে যে! তখন এই বউদিকে ভুলে গেলে চলবে না! ও হ্যাঁ, একটা লোক এসে তোমার খোঁজ করছিল। নেই শুনে মোবাইলের নম্বর চাইল, দিয়ে দিয়েছি।"

"কে?"

"কী একটা নাম বলল, মনে রাখতে পারিনি।"

"রাখছি," ফোন বন্ধ করল অমল। তারপর বলল, "কেউ একজন আমার খোঁজে গিয়েছিল বাড়িতে। মোবাইলের নম্বর নিয়ে গিয়েছে।"

রিজুলা কোনও কথা বলল না।

কোয়ালিটির কাছাকাছি ব্যাঙ্কের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে নীচে নামল রিজুলা। পাশেই চশমার দোকান। সেখানে ঢুকে মিনিটদেড়েকের মধ্যে বেরিয়ে এল সে। রিকশার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কাছে দু'শো টাকা আছে? এত বড় চশমার দোকান, হাজার টাকার খুচরো নেই!"

পকেটে হাত ঢুকিয়ে অমল দেখল, তিনশো দশ টাকা রয়েছে। তার থেকে দু'শো দিয়ে দিল। দু'মিনিটের মধ্যে দোকান থেকে চশমার খাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল রিজুলা।

অমল বলল, "ওই ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে নাও না?"

"এখন আর দেরি করব না। মাসি খেপে যাবে!" রিজুলা বলল।

বৃদ্ধ একইভাবে বসেছিলেন। চশমা পেয়ে খুব খুশি। রিজুলা বলল, "আপনার চশমার খরচ অমল দিয়ে দিয়েছে।"

"তাই? তা হলে তো এখনই টাকাটা নিয়ে আসতে হয়।"

"পরে দেবেন। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে বলে আমি ওকে রাজি করিয়েছি এখান থেকেই স্নান খাওয়া করে যেতে," রিজুলা বলল, "ও চাইছিল না।"

"কেন? খেয়ে যাও। কিন্তু..." বৃদ্ধ থেমে গেলেন।

"যা আছে, তা আমরা ভাগাভাগি করে খেয়ে নেব।"

"গুড! এখন থেকেই শেয়ার করতে শেখো!" বৃদ্ধ উঠে বললেন, "আমি যাই, একটু গড়িয়ে নিই।"

তিনি চলে গেলে রিজুলা বলল, "তোমার ফোনটা এখন বন্ধ করে দাও। কাউকে সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না।"

"তোমার কথা বুঝতে পারলাম না," অমল অস্বস্তিতে।

"ওঃ, সত্যি তুমি বড্ড সরল। ওই মোবাইল অন রাখলে ওরা খোঁজ পেয়ে যাবে তুমি কোথায় আছ! পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষণ মামলায় পুলিশ মোবাইল থেকে অপরাধীদের সন্ধান পেয়েছিল, তুমি খবরের কাগজে পড়োনি?" রিজুলা জিজ্ঞেস করল।

দ্রুত মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল অমল।

রিজুলা হাসল, "এবার তুমি ওই বাথরুমে চলে যাও। আমি মাসিকে ম্যানেজ করে খাবারের ব্যবস্থা করছি।"

দুপুরের খাওয়া শেষ হওয়ার পর রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "পেট ভরেছে?"

"খু-উ-ব।"

"তুমি কি এখন খিদিরপুরে যাবে?"

"বিকেলে যাওয়ার কথা। যতক্ষণ ব্যাগটা রফিককে দিতে না পারছি ততক্ষণ অস্বস্তি থেকেই যাচ্ছে। এখান থেকে বেরিয়ে মোবাইলে ওকে ডেকে নেব," অমল বলল।

"তুমি খুব অনেস্ট ছেলে।" রিজুলা অন্যরকম গলায় বলল।

হেসে ফেলল অমল, "এই তো বললে, আমি বড্ড সরল! সরল আর বোকার মধ্যে পার্থক্য কম। যাক গে, তুমি কি এই বাড়িতেই থাকবে?"

"তাই ভেবেছিলাম। এখন এই টাকাগুলো পাওয়ার পর মনে হচ্ছে অন্য কিছু করা দরকার।" রিজুলা বলল।

"কিছু মনে কোরো না, তুমি এত জানো কী করে?"

"মানে?"

"তোমার বয়সি কোনও বাঙালি মেয়ে যা পারে না, তা তুমি অবলীলায় পার! বেশ ভেবে-চিন্তে কাজ করতে পার। ধরো, ব্যাঙ্ককে তোমার সঙ্গে যদি আমার দেখা না হত, তা হলে তুমি তো সেখানেই থেকে যেতে।"

"শোনো, আমি এই 'যদি' বা 'ধরো' শব্দগুলো একদম বিশ্বাস করি না। আমি যা করি তা জীবন থেকে শেখা," রিজুলা বলল।

"অদ্ভুত, আজ আড়াই লাখ টাকা পেয়েও তোমার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না!"

"আমিও একসঙ্গে আড়াই লাখ টাকা পাওয়া দূরের কথা, কোনওদিন চোখেও দেখিনি। কিন্তু জানি, বেঁচে থাকার পক্ষে ওই টাকার কোনও মূল্য নেই। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম বলে ব্যাঙ্ককে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ক্রমশ যখন বুঝতে পারলাম, ওরা আমাকে সেক্স ট্রেডে নিয়ে যেতে চাইছে, তখন পালাতে চাইছিলাম! হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা অ্যাক্সিডেন্ট! তা জীবনের অনেক কিছু তো অ্যাক্সিডেন্ট থেকেই হয়ে যায়।" রিজুলা বলল।

"তুমি কারও প্রেমে পড়োনি? মানে কাউকে ভালবাসোনি?"

হেসে ফেলল রিজুলা, "এক-দু'বার সেরকম পরিস্থিতি হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই বুঝতে পেরেছিলাম, ব্যাপারটা আমার দিক থেকে এক তরফা। বুঝে সরে এসেছিলাম ঠিক সময়ে। তোমাকে দেখে, কথা বলে, আমার মনে হয় তুমি প্রেম থেকে বঞ্চিত নও। তাই না?"

"জানি না। আমার এক বন্ধুর বোন, যাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি, আমাকে ফোন করে, আমি ফোন না করলে ওর খারাপ লাগে। আমাকে কখনও সরাসরি ভালবাসার কথা বলেনি। কিন্তু ওর জন্য আমার কষ্ট হয়।"

"কেন?" রিজুলা বলল, "এত ভাল সম্পর্ক ক'জনের ভাগ্যে তৈরি হয়?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সকলে জানি, সে-ও জানে, বেশিদিন পৃথিবীতে থাকবে না।"

"সে কী!" চমকে উঠল রিজুলা, "কেন?"

"ও রক্তের অসুখে ভুগছে। হিমোগ্লোবিন চারের কাছে নেমে যায়। আমাকে কেউ বলেনি অসুখটা কী। অনুমান করেছি, হয় লিউকোমিয়া নয়তো প্রচণ্ড রক্তশূন্যতায় ভুগছে ও। ওর দাদার মুখে শুনেছি, ডাক্তার কোনও ভরসা দিতে পারছেন না," বিষণ্ণমুখে বলল অমল।

হাত বাড়িয়ে অমলের কব্জি স্পর্শ করল রিজুলা, "খুব খারাপ লাগছে শুনে।"

অমল বলল, "আমাদের এই সম্পর্কটা খুব অদ্ভুত। ওর মা চাইছেন না আমার কারণে ও উত্তেজিত হয়। উত্তেজিত হলেই রক্ত বেরিয়ে আসে শরীর থেকে। অথচ ও ফোন করলে আমি 'না' বলতে পারি না। ওর যাতে খারাপ না লাগে তাই বানিয়ে-বানিয়ে ভাল কথা বলতে হয়। এই অভিনয় করতে আমার একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু না করলে..."

"তুমি অন্যায় করছ না," রিজুলা বলল।

"এখন ক'টা বাজে?" হঠাৎ খেয়াল হল অমলের।

"দুটো চল্লিশ।"

"আমি তা হলে যাই?" উঠে দাঁড়াল অমল।

"তোমার সঙ্গে আমার কি দেখা হতে পারে?" রিজুলা জিজ্ঞেস করল।

"বা রে! কেন হবে না!" অমল বলল, "আজ কোম্পানি আমাকে আবার বাইরে পাঠাতে পারে। কী জানি, কোথায় পাঠাবে!"

রিজুলা তাকাল, "এই কাজ করার আগে তুমি কী করতে?"

হেসে ফেলল অমল, "অনেক চেষ্টা করেও চাকরি না পেয়ে একটা সিকিউরিটি কোম্পানিতে ঢুকেছিলাম সামান্য মাইনেতে।"

"ও! কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ক্যারিয়ারের কাজটা খুব নিরাপদ নয়। প্রতিবার তোমাকে অবৈধ জিনিস বয়ে নিয়ে আসতে হবে এ দেশে। যদি ধরা পড়ে যাও তা হলে..." রিজুলা থেমে গেল।

"এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েছে?"

"আমি জানি না।"

"কিন্তু আর কিছু করার সুযোগ তো আমার সামনে নেই।"

"ছিল না, এখন আছে।"

"মানে?"

"এখন তোমার পকেটে আড়াই লাখ টাকা এসেছে! তার সঙ্গে আমার টাকা যোগ করলে পাঁচ হবে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে এই টাকায় আমরা ব্যবসা শুরু করতে পারি। তোমাকে এখনই হ্যাঁ বলতে হবে

না। ভেবে নিয়ে আমায় বোলো," কথাগুলো শেষ করে রিজুলা চামড়ার ব্যাগটা এনে দিয়ে বলল, "সাবধানে নিয়ে যেও।"

দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিল রিজুলা। বলল, "ফোন করতে ভুলো না," তারপরই গলা তুলে বলল, "একটু দাঁড়িয়ে যাও, প্লিজ।"

অমল দেখল, রিজুলা ভিতরে ঢুকে গেল। ওর মনে হল, সোহাগের সঙ্গে রিজুলার কিছুটা মিল আছে। মিলটা ঠিক কোথায়, তা চট করে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অনুভব করতে পারছে সে। সোহাগের কথা মনে আসতেই সে ঠোঁট কামড়াল। ওর মা ডাক্তারকে ফোন করেছিলেন। ডাক্তার এসে কী বলল? না, সোহাগ নিশ্চয়ই ভাল আছে। এই ভরদুপুরে যদি ও ঘুমিয়ে থাকে, তা হলে ফোন করে ঘুম ভাঙানো অন্যায় হবে।

"এই নাও," চারটে পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে ধরল রিজুলা।

"ও!" হেসে ফেলল অমল, "এখনই দিতে হল!"

"বা রে, দিতে তো হবেই। চশমা দেখলেই দাদু আমাকে দেবেন। তা ছাড়া তোমার পকেটের হাজার টাকার নোট তো ট্যাক্সিওয়ালা ভাঙিয়ে দেবে না।" রিজুলা হাসল, "ট্যাক্সিতে যেও কিন্তু।"

মাথা নেড়ে হাঁটতে শুরু করল অমল। তার হাতের ব্যাগে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা আছে তা জানতে পারলে পৃথিবীর সব ছিনতাইবাজ ছুটে আসবে! ব্যাগটাকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরতে গিয়েও সতর্ক হল সে, ওভাবে ধরলে যে দেখবে, সে-ই সন্দেহ করবে। কেন যে মিস্টার হক একটা হ্যান্ডেলওয়ালা ব্যাগ দিলেন না!

শুনশান বাসস্টপ। মোবাইল বের করে রফিককে ফোন করল অমল। রিং শুরু হওয়ার বেশ কিছুটা পরে রফিকের গলা কানে এল, "হ্যালো!"

"আমি অমল বলছি। আপনি এখন কোথায়?"

"তোমার জন্য কফিন তৈরি করছি!" চেঁচিয়ে বলল রফিক।

"করতে হবে না। আপনার পরিশ্রম বেঁচে গেল।" হঠাৎ সাহসী হল অমল।

"তার মানে?"

"আমি ব্যাগটা পেয়েছি!"

"সত্যি? সত্যি কথা বলছ?"

"আমি মিথ্যে কথা বলা পছন্দ করি না।"

"উঃ! আমাকে তুমি বিশাল বিপদ থেকে বাঁচালে।"

"কীরকম?"

"তার আগে বলো, ব্যাগটা যেমন ছিল তেমন আছে তো?"

"একদম একই আছে।"

"সাবাস!" রফিক বলল, "বস তোমাকে রিসিভ করতে আমাকে এয়ারপোর্টে যেতে বলেছিল। তোমার আর মেয়েটার ছবিও নেটে পাঠিয়েছিল। আমি তোমাকে চিনতে পারলাম, অথচ মেয়েটাকে পারলাম না। পারলে সে হাওয়া হয়ে যেতে পারত না! বস আমার এই ভুল ক্ষমা করত না। বলত, মেয়েটার ছবি তোমাকে পাঠালাম কেন, জবাব দাও। অতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়ে গেলে আমাকে আর জিন্দা রাখত না। থ্যাঙ্ক ইউ! কিন্তু পেলে কী করে?"

"টেলিফোনে সব বলব?" হাসল অমল।

"আরে না, না। তুমি এখন কোথায় আছ?"

"উল্টোডাঙ্গায়।"

"সাবাস। তা হলে মেয়েটা ওই হাউজিংয়েই ছিল! লাঞ্চ করেছ?"

"না।"

"তুমি তোমার বাড়িতে চলে যাও, আমি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

"কিন্তু আমার বাড়িতে এসব কথা আলোচনা করা যাবে না।"

"আরে ভাই, আমাকে আনসোশ্যাল ভাবছ কেন? কোনও আলোচনাই করব না। শোনো, ব্যাগটা সাবধানে নিয়ে যাও। ট্যাক্সি করো, যা খরচ হবে, দিয়ে দেব। বাই," রফিকের গলার স্বর পাল্টে গিয়েছে একদম!

ট্যাক্সিতে বিরাশি টাকা খরচ হল। ঠিক বাড়ির সামনে না নেমে খানিকটা দূরে নামল অমল।

বেল বাজাতেই দরজা খুলল মা। ওকে দেখেই হাউমাউ করে উঠল, "এ কী চাকরি! বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, বাড়িতেও থাকতে দিচ্ছে না। সেই সাতসকালে চা না খেয়ে বেরিয়ে গিয়ে এই ফিরলি! টাকা দেবে বলে তোকে ওরা এভাবে খাটাবে?"

পিছন থেকে বউদির গলা ভেসে এল, "মা, এ জন্যই বলে রেখেছ বাঙালি করেছ মানুষ করোনি। আমার ভাই সকাল সাত'টায় আই টি সেক্টারে গিয়ে রাত এগারোটায় বাড়ি ফেরে। আজকালকার কাজের ধরনই এইরকম।"

কথাটা পছন্দ হল না মায়ের সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা গেল। বলল, "যা, স্নান করে আয়, ভাত বাড়ছি।"

"আমার স্নান খাওয়া হয়ে গিয়েছে।" নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল অমল।

"ওমা! কোথায় স্নান করলি?"

"এক বন্ধুর বাড়িতে।"

বউদি ফোড়ন কাটল, "কী ব্যাপার? আজ পর্যন্ত কখনই অন্যের বাড়িতে গিয়ে স্নান করেছ বলে শুনিনি!"

অমল জবাব দিল না। ঘরে ঢুকে ব্যাগটা টেবিলে রেখে বাথরুমে যেতে গিয়েও থমকাল। তারপর ওটা হাতে নিয়ে সেখানে ঢুকল। বউদিকে বিশ্বাস নেই, এরকম ব্যাগ দেখলেই কৌতূহলী হবে। কিন্তু পকেটের টাকাগুলো কোথায় রাখবে সে? রফিক না হয় এই ব্যাগ নিয়ে চলে যাবে, তারপর? তার ঘরে যে কাঠের আলমারি আছে, তার ভিতরে আড়াই লাখ টাকা রাখার কথা ভাবতেও পারছে না সে। কী করা যায়? এই টাকার কথা কাউকে বলা চলবে না। মায়ের কাছে রাখতে চাইলে হাজারটা প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে। বউদি-দাদা জানবে। সোহাগের কাছে তো বলাই যাবে না। সে কোনও অসৎ কাজ করেছে জানলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে মেয়েটা।

মোবাইল জানান দিতে সেটা তুলল অমল। আশ্চর্য! বহু কাল বাদে শোভনের ফোন এল। 'হ্যালো' বলতেই শোভন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে?"

"কী হয়েছে মানে?" অমল অবাক!

"আজ সকালে বেঙ্গালুরু থেকে হায়দরাবাদ এসেছি অফিসের কাজে। তার মধ্যে মায়ের দু'-দু'বার ফোন এল। তুই সোহাগকে কিছু বলেছিস?" শোভন জিজ্ঞেস করল।

"না তো, সাধারণ কথাই হয়েছিল। কেন?"

"ও নাকি সকাল থেকে ভাবছিল, তোর খারাপ কিছু হয়েছে! এমনকী, সকালে আবার যখন ওষুধ খেয়ে ঘুমায়, তখন স্বপ্নে দেখেছে তোকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে! মায়ের ধারণা, তুই এমন কিছু বলেছিস বলে সোহাগের মনে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে," শোভন কেটে-কেটে কথাগুলো বলল।

হাসতে চেষ্টা করেও পারল না অমল। বলল, "কী আশ্চর্য!"

শোভন বলল, "তুই তো ওর অসুখের ব্যাপারটা জানিস। যে ক'টাদিন বাঁচে সেই ক'টাদিনই আমাদের আনন্দ। তাই না?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুই ওর সম্পর্কে দুর্বল, এটা তোর ব্যবহারেই ওর মনে হয়েছে। আর মেয়েরা, সুস্থ বা অসুস্থ যাই হোক না কেন, এরকম ক্ষেত্রে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ভবিষ্যৎ কী তা জেনেও তোর সম্পর্কে ওর মনের অবস্থা এই জায়গায় নিয়ে যাওয়া খুব অন্যায় হয়েছে। বুঝতে পারছিস কি?" শোভন জিজ্ঞেস করল।

অমল বলল, "বিশ্বাস কর শোভন, আমি কখনও ওকে ভালবাসার কথা বলিনি। ও কখনও সেরকম কিছু বোঝায়নি। আমি চেয়েছিলাম, ওকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে, মনের জোর বাড়াতে।"

"তোর এই চেষ্টাটাকেই হয়তো ও...যাক গে, আমি ব্যাপারটা তোকে বলতে বাধ্য হলাম। আশা করি, কিছু মনে করিস নিই। বাই!"

শোভন লাইন কেটে দেওয়ার পরেও কয়েক সেকেন্ড মোবাইল হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল অমল। সোহাগকে এত দিন খুব কাছের মানুষ বলে মনে হত। কিন্তু যখন বুঝতে পারল ওকে সব বলা যায় না, বললে কষ্ট পায়, শরীর খারাপ হয় ওর, তখন ভেবেচিন্তে কথা বলত। সেটা সোহাগকে উৎসাহিত করার জন্যই বলত। সোহাগ যে তার সম্পর্কে ভাবে, তা সে জানে কিন্তু ভাবনাটা যে ওকে গ্রাস করে নিয়েছে, তা কখনও মনে হয়নি। শ্বাস ফেলল অমল।

বাইরের বেলের বোতাম কেউ টিপতেই অমল অনুমান করল, রফিক এসে গিয়েছে। সে ব্যাগটাকে নিয়ে এগোতেই দেখতে পেল বউদি দরজা খুলতে যাচ্ছে। অমল তাকে বলল, "আমি খুলছি, আমার কাছেই এসেছে।"

"কী করে বুঝলে?"

"সেরকমই কথা ছিল," বলতে-বলতে দরজাটা খুলতেই দেখল রফিক দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় তার গাড়ি।

রফিক কপালে আঙুল ছোঁয়াল, "নমস্কার অমল ভাই, এই সময় এসে ডিস্টার্ব করলাম না তো?"

"না, না। ঠিক আছে। আপনার..."

"গাড়িতে আসুন না। এসি চলছে, আরামে কথা বলি।"

রফিকের সঙ্গে গাড়ির পিছনে বসতেই ঠান্ডা বাতাস টের পেল অমল।

তার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল রফিক, "এই ব্যাগ?"

"হ্যাঁ," অমল মাথা নাড়ল।

চোখের সামনে ব্যাগ তুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখল রফিক। তারপর দু' ধারের সেলাইয়ের উপর আঙুল বোলাল চোখ বন্ধ করে। তারপর হাসল,

"হ্যাঁ, এই ব্যাগ।"

"আমি আপনাকে মিথ্যে বলেছি মনে হচ্ছিল?"

"না, না। সব কিছু যাচাই না করে অ্যাকসেপ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু ভাই, এই ব্যাগ পেলেন কী করে? প্রতিটি ফ্ল্যাট নক করেছিলেন নাকি?"

"প্রাণের ভয়ে! না পেলে কাল সকালে আমি বেঁচে থাকতাম না।"

"একশোবার। তাকে পেলে কোথায়?"

"রাস্তায়।"

"অ্যাঁ! রাস্তায় মানে?"

"ও কোথাও যাচ্ছিল। দেখা হল হাউজিংয়ের গেটের সামনে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ব্যাগটা নিয়ে আমায় না বলে চলে এলে কেন? সে জানাল, আমার উপর তার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। কাস্টমস যখন তাকে ধরেছিল, তখন আমি কেন ওকে সাহায্য করিনি! ধরা পড়লে তো ওকেই জেলে যেতে হত। কথাটা অবশ্যই ঠিক..." অমল বলল।

হাত নাড়ল রফিক, "আগে বলুন..."

"সকালে উঠে নাকি ওর রাগ পড়ে গিয়েছিল। ব্যাগটা খোলা যায় না, সেই ব্যবস্থাও নেই। ওটা নিয়ে কী করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। দেখা হওয়ায় বলল, তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও," অমল বলল।

"ওর হাতেই ব্যাগ ছিল?"

"না। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যে ফ্ল্যাটে ছিল, সেই ফ্ল্যাট থেকে নিয়ে এসেছিল।" অম্লানবদনে মিথ্যে বলে যাচ্ছিল অমল।

"মাই গড! যদি ও আবার হাওয়া হয়ে যেত?"

"হয়নি তো। আমি ওকে বিশ্বাস করেছি, ও অবিশ্বাসের কাজ করেনি।"

"যাক গে!" রফিক মাথা নাড়ল, "এর মধ্যে কী আছে আন্দাজ করতে পারেন?"

"না। করতে চাই না। মিস্টার হক এ ব্যাপারে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।"

"সাবাস! ঠিক হ্যায় ভাই!" হাত বাড়াল রফিক।

বাধ্য হয়ে হাত মেলাল অমল। তারপর সময় দেখল সে মোবাইলে, "আপনি কোন দিকে যাবেন?"

"এসপ্ল্যানেড।"

"আমি ওই অবধি যেতে পারি?"

"শিওর। কোথায় যাবে?"

"খিদিরপুরে।"

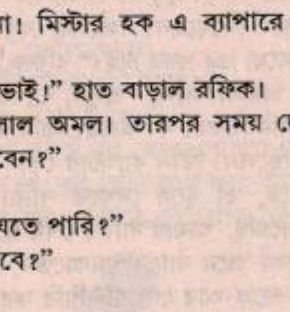

এসপ্ল্যানেড নয়, খিদিরপুরের মুখে ওকে নামিয়ে দিয়ে রফিক চলে গেল। লোকটা যখন ব্যাগের সেলাই কেটে টাকা বের করে গুনবে, তখন ওর কী প্রতিক্রিয়া হবে? নিশ্চয়ই ফোন করে ব্যাঙ্ককের হকসাহেবকে জিজ্ঞেস করবে, ব্যাগে কত টাকা ছিল? পাঁচ লক্ষ হাওয়া হয়ে গিয়েছে অথচ ব্যাগের সেলাই ঠিক আছে, রফিক নিশ্চয়ই ছুটে আসবে তার কাছে! আসুক! সে স্রেফ অস্বীকার করবে। পুরো ব্যাগ সেলাই করা ছিল, সে কী করে জানবে ওর ভিতর থেকে টাকা কমে গেল কী করে!

মিস্টার আহমেদ অফিসে ছিলেন না। কিন্তু অপেক্ষা করার ঘরে আর একটি ছেলের সঙ্গে বসে রবীন কথা বলছিল। তাকে ঢুকতে দেখেই রবীন উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে ব্বাস। তুই যে ভিনি-ভিডি-ভিসি করে ফেললি!"

"মানে?" হকচকিয়ে গেল অমল।

"খুব সিম্পল। আমার হাত ধরে ঢুকে আমাকেই পিছনে ফেলে উড়ছিস!"

"ধুত, কী আজেবাজে বকছিস!" চেয়ারে বসল অমল।

"আজে-বাজে? ম্যাডাম তোকে স্রেফ বেড়ানোর জন্য ব্যাঙ্কক পাঠাননি? তোর আগে কারও এই সৌভাগ্য হয়েছে?" রবীন হাসল।

"আমি কখনও যাইনি বলে সার্ভে করতে পাঠিয়েছিলেন।"

"তার মানে তুই ওঁর গুড বুকে চলে গিয়েছিস। এখন অন্য সব কোম্পানি তোর পিছনে ছুটবে। তা ছাড়া তুই যে ছুপা রুস্তম, তা জানতাম না। এর কাছে শুনলাম। একে চিনিস?" রবীন পাশের ছেলেটিকে দেখাল।

"না!" মাথা নাড়ল অমল।

ছেলেটি বলল, "চিনবেন কী করে! ভাইয়ার তখন অন্য কারও দিকে তাকানোর সময় ছিল না। আমি পিটার। প্লেনে আপনার পিছনের সিটে বসেছিলাম।"

খোঁচাটা হজম করে অমল জিজ্ঞেস করল, "যাওয়ার সময়?"

"না, না। ব্যাঙ্কক থেকে ফেরার সময়!" পিটার বলল।

"মেয়েটা কে রে? আমি চিনি?" রবীন জিজ্ঞেস করল।

"আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টেই আলাপ।"

"ক্যারিয়ার মেয়ে যে ক'জন আছে, তাদের সবাইকে তো চিনি।"

"না, ও ক্যারিয়ার নয়।"

পিটার বলল, "কিন্তু ভাইয়া, আপনাদের দেখে মনে হচ্ছিল অনেক দিনের চেনা! আমি তো ভেবেছিলাম, কোনও ফিল্মস্টার হবে। কলকাতার কাস্টমসের সঙ্গে যেভাবে ঝামেলা করে মাল বের করে নিয়ে গেল, তাতে বুঝলাম বুকের পাটা আছে!"

"কী মাল ছিল রে?" রবীন জিজ্ঞেস করল।

"আচ্ছা, আমি জানব কী করে?"

"এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে তোরা কোথায় গিয়েছিলি?"

"ও ওর মতো ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছিল," অমল বলল।

"না অমল। মনে হচ্ছে, দাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়। যাক গে, ওসব মেয়ের পাল্লায় পড়ে ম্যাডামের সঙ্গে দু'নম্বরি করিস না। অন্য কোথাও কাজ করতে চাইলে এদের জানিয়ে করবি। পুরনো দোস্ত বলে সাবধান করে দিলাম!" রবীনের কথা শেষ হতেই মিস্টার আহমেদ ঘরে ঢুকে তাকে ইশারা করে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। পিটারের মুখোমুখি বসে থাকল অমল। পিটার হাসল, "ওই মেয়েটাকে আমি কয়েকবার ব্যাঙ্ককে এয়ারপোর্টে দেখেছি।"

"তাই?"

"কোনও বাঙালি একা নামলেই তার সঙ্গে কথা বলত। তারপর চলে যেত।"

"আপনার সঙ্গে কথা বলেনি?"

"না, আমি চান্স দিইনি। তা ছাড়া হয়তো বুঝেছিল আমি বাঙালি নই। এখন তো ব্যাঙ্ককে অনেক ইন্ডিয়ান মেয়ে সেক্স বিজনেসে আছে। আপনাকে কিছু বলেনি? দেখে মনে হচ্ছিল, ওর কথা শেষ হচ্ছে না!" পিটার চোখ টিপল।

"না। ভদ্রভাবে গল্প করছিল।"

মিস্টার আহমেদের ঘরে পিটারের ডাক পড়ল। একা বসে অমল ভাবল, গতকাল বুঝতেই পারেনি কেউ তাদের লক্ষ করেছে! কথাটা নিশ্চয়ই ম্যাডাম বা মিস্টার আহমেদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। তা হলে রফিক যে তাকে ওর গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেই খবরটা নিশ্চয়ই এরা জেনেছে! যদি প্রশ্ন করে তা হলে কী জবাব দেবে? রফিককে সে চিনল কী করে? আর রফিক যে ব্যাঙ্ককের মিস্টার হকের লোক, তা-ও নিশ্চয়ই এদের জানার কথা। একটা যুক্তিপূর্ণ উত্তর খাড়া করার চেষ্টা করছিল অমল। মিস্টার হকের কাছে কার্ড দিয়ে তাকে যেতে বলেছিলেন মিস্টার আহমেদ। মিস্টার হক যদি তাকে বলেন যে, মাঝরাতে দমদম এয়ারপোর্টে তাঁর লোক থাকবে যে বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারে, তা হলে সে কী করে প্রত্যাখ্যান করবে?

পিটার বেরিয়ে যাওয়ার সময় হাতের ইশারায় জানিয়ে গেল ভিতরে যেতে। ঘরে ঢুকে অমল দেখল, রবীন গম্ভীর মুখে বসে আছে। মিস্টার আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন হল ব্যাঙ্কক ট্যুর?"

"একদিনে যেটুকু দেখা যায়।"

"মিস্টার হকের কাছে তুমি যে মেয়েটির সঙ্গে গিয়েছিলে সে কে?"

"ব্যাঙ্ককেই পরিচয় হয়েছিল," অমল বলল।

"তুই তো একটু আগে বললি, ফেরার সময় এয়ারপোর্টে আলাপ হয়েছিল?"

"আমি ফেরার সময় বলিনি। বলেছি, এয়ারপোর্টে আলাপ হয়েছিল।"

মিস্টার আহমেদ বললেন, "তোমাকে বলা হয়নি তাই...শোনো, বিদেশে গিয়ে কোন পরিচিত বা অপরিচিত মহিলার সঙ্গ এড়িয়ে চলবে। ম্যাডাম শুনলে খুব অপছন্দ করবেন। তুমি জান না মেয়েটা কে? ও তোমাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারত!"

"মনে থাকবে।"

"মিস্টার হক তোমাকে কী বললেন?"

"আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ। তোমাকে কী বললেন?"

"বলেছিলেন, দমদম এয়ারপোর্টে ওঁর লোক থাকবে, প্রয়োজন হলে সে আমাকে রাতে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।"

"দমদমে লোকটা তোমাকে চিনল কী করে?"

"মিস্টার হক ই-মেলে আমার ছবি পাঠিয়েছিলেন।"

"মেয়েটা কোথায় গেল?"

"আমি বেরনোর আগেই সে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছে।"

"তুমি কী করছিলে ভিতরে?"

অমলের মনে পড়ল, তার প্যান্টের হিপ পকেটে প্রি পেড ট্যাক্সির রসিদটা থেকে গিয়েছে। সেটা বের করে মিস্টার আহমেদের সামনে রেখে সে বলল, "আমি প্রি পেড ট্যাক্সির লাইনে ছিলাম।"

এক নজরে সেটা দেখে নিয়ে মিস্টার আহমেদ বললেন, "তা হলে তো তোমার ট্যাক্সিতেই বাড়ি যাওয়ার কথা। অচেনা লোকের গাড়িতে উঠে খুব অন্যায় করেছ। তোমার সঙ্গে যদি জিনিস থাকত, তা হলে সেটা হাতছাড়া হয়ে যেত!"

সোজা হয়ে বসলেন মিস্টার আহমেদ, "অমল, ম্যাডাম ভবিষ্যৎ দেখতে পান বলে তোমাকে পরীক্ষা করতে ব্যাঙ্ককে পাঠিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষায় তুমি মাত্র ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছ! কয়েকটা বড় ভুল তোমার বিরুদ্ধে গিয়েছে।"

"আই অ্যাম সরি!" তিনটে ইংরেজি শব্দ বেরিয়ে এল অমলের মুখ থেকে।

"এই লাইনে 'সরি' শব্দের কোনও মূল্য নেই। ভবিষ্যতে যাতে না বলতে হয় তার জন্য নিজেকে তৈরি করবে। ওয়েল, তোমাকে বলেছিলাম আজই বাইরে যেতে হতে পারে। কিন্তু দরকার নেই। আগামীকাল তৈরি থেকো। তোমাকে হরিদ্বারে যেতে হতে পারে।"

"হরিদ্বার?" অমল অবাক হল।

"গিয়েছ কখনও?"

"হ্যাঁ, বছরআটেক আগে মা-দাদার সঙ্গে গিয়েছিলাম।"

"ফরগেট দ্যাট। কাল দুপুর একটা দশে উপাসনা এক্সপ্রেস অথবা রাত আটটা পঁয়ত্রিশের দুন এক্সপ্রেসে যেতে হবে তোমাকে। কাল সকাল দশটায় আমাকে ফোন করবে। এখন তুমি যেতে পার," গম্ভীরমুখে বললেন মিস্টার আহমেদ।

বাইরে বেরিয়ে এল অমল। বিদেশে যেতে হবে না বলে স্বস্তি পাচ্ছিল সে। কিন্তু তখনই মনে হল, এই হরিদ্বারে গেলে কত টাকা পাওয়া যাবে, তা বললেন না মিস্টার আহমেদ। এখন ফিরে গিয়ে সেটা জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ বোধ করল সে। কাল সকালে ফোনে জিজ্ঞেস করতে হবে। টিকিটের সঙ্গে অন্য খরচের টাকাও তো দেবে। হঠাৎ খেয়াল হল, ব্যাঙ্ককে গিয়ে যা খরচ হয়েছিল, তার হিসেব এবং বেঁচে যাওয়া ভাট মিস্টার আহমেদকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ফোন করতেই মিস্টার আহমেদের গলা শুনতে পেল।

"স্যার, আমি অমল বলছি।"

"কী ব্যাপার?" মিস্টার আহমেদ বেশ বিরক্ত।

"ব্যাঙ্ককের খরচের হিসেব আর খরচ না হওয়া ভাট আপনাকে ফেরত দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন কি আপনার কাছে যেতে পারি?"

"না, দরকার নেই। কাল সকালে ফোন করলে ইনস্ট্রাকশন পাবে।"

ওপাশে লাইন কেটে দেওয়ায় হাঁটা শুরু করল অমল। আজ রবীন যে ব্যবহার করেছে, সেটাও ভাল লাগছিল না তার। একথা ঠিক, তাকে প্রচুর মিথ্যে বলতে হচ্ছে। সত্যি কথা বহু দিন ধরে হাজার বার বলা যায়, কিন্তু মিথ্যে দু'-একবার বলার পরে মনে থাকে না!

ট্রাম ধরে ধর্মতলায় পৌঁছতেই মোবাইল বেজে উঠল। রফিক ফোন করছে। আড়ষ্ট হয়ে ভাবল ফোনটা ধরবে না। পাশ থেকে একটা লোক বলে গেল, "ভাই, আপনার ফোন বাজছে!" যেন তার কথাতেই আঙুল বোতামে চাপ দিল।

রফিকের গলা কানে এল, "অমলভাই, আপনি তো আমাকে বিপদে ফেললেন!"

গলা শুকিয়ে গেল অমলের, "আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"পারছেন না? আপনি কি ব্যাগটা হাতে পেয়েই আমাকে ফোন করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ব্যাগের ভিতরে কী ছিল?"

"আশ্চর্য! ওই ব্যাগ খোলার কোনও উপায় ছিল না, জানব কী করে?"

"কাল থেকে আপনাকে দেখছি বলেই বুঝছি আপনি সত্যি বলছেন। ওই মেয়েটা, কী যেন ওর নাম..."

"রিজুলা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কোন ফ্ল্যাটে আছে?"

"আমাকে বলেনি। আমার সঙ্গে হাউজিংয়ের গেটের কাছে দেখা হয়েছিল।"

"খুব ভুল করেছেন, ও কোন ফ্ল্যাটে উঠেছে, তা দেখে আসা উচিত ছিল।"

"কেন?" একটু ধাতস্থ হল অমল।

"আপনার বান্ধবী এই ব্যাগ খুলেছিল।" রফিক বলল।

"প্রথম কথা, ও আমার বান্ধবী নয়। দ্বিতীয়ত, ও ব্যাগ কী করে খুলবে? কোনও মুখ ছিল না, দু'পাশে সেলাই করা ছিল," অমল বলল।

"সেলাই কেটে ভিতর থেকে মাল বের করে নেওয়া যায়!" রফিক বলল, "ওই মেয়েটি সেই কাজটাই করেছে।"

"কী ছিল ব্যাগের মধ্যে?" অমল অভিনয় করল।

"কী ছিল, তা আপনি জানেন না?" রফিকের গলায় অন্য সুর। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সেটা বদলে ফেলল, "আপনার জানার কথাও নয়। কিন্তু মেয়েটাকে এবার চাই।"

"কেন?"

"ব্যাগের ভিতরে পঞ্চাশ লাখ টাকা ছিল। ব্যাগ খুলে দেখলাম, পঁয়তাল্লিশ লাখ পড়ে আছে। পাঁচ লাখ হাওয়া হয়ে গিয়েছে!"

"সে কী! ওর ভিতরে অত টাকা কী করে থাকবে?"

"এক হাজার টাকার নতুন বান্ডিল একশোটাতেই এক লাখ হয়!"

"সর্বনাশ! ওই অত টাকা আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মিস্টার হক? যদি ধরা পড়তাম, তা হলে নির্ঘাত জেলে যেতাম। আর এজন্য মাত্র আট হাজার টাকা দিয়েছিলেন তিনি!" রেগে যাওয়ার ভান করল অমল।

"অমলভাই, ক্যারিয়ার মানে জানেন? গাধা! যারা মোট বয়ে নিয়ে যায়। আপনি যে গিয়েছেন, তাতে পঞ্চাশ লাখ টাকার মাল নিয়ে এলে তিন-চার হাজারের বেশি পাবেন না। হকসাহেব তো ডাবল দিয়েছেন। যাক গে, মেয়েটাকে খুঁজে বের করুন। খুব ঘুঘু মাল! আপনি ওকে একদম বলবেন না যে, এই ব্যাপারটা জেনে গিয়েছেন। বললেই কেটে পড়বে। যেমন করেই হোক কাল বিকালের মধ্যে ওর খবর চাই!" রফিক জোর দিয়ে বলল।

এবার রেগে গেল অমল। বলল, "শুনুন, ব্যাগটা যখন আমাকে দেওয়া হয়েছিল, তখন বলা হয়নি ভিতরে কী আছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম বলে হকসাহেব রেগে গিয়েছিলেন। তিনি ব্যাগটার কোন মুখ রাখেননি যে আমি ওটার ভিতরে কী আছে, তা খুলে দেখতে পারি। ওই ব্যাগ শেষ পর্যন্ত আপনার হাতে তুলে দিয়েছি, আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। মিস্টার হক যদি আমার সামনে টাকা গুনে ব্যাগে ঢোকাতেন, তা হলে নিশ্চয়ই আমি দায়িত্ব নিতাম। আমার পক্ষে আর গোয়েন্দাগিরি করা সম্ভব নয়।"

"গোয়েন্দাগিরি মানে?"

"ব্যাগটা পাওয়ার জন্য অনেক ঝামেলার পরে মেয়েটাকে পেয়েছি। এখন আপনি আবার ওকে খুঁজতে বলছেন। অথচ ব্যাগের ভিতরের টাকা কমে গিয়েছে, তা বলা যাবে না। কেন আমি কাজটা করব? টাকার ব্যাপারে আমার কোনও দায়িত্ব নেই!" অমল বেশ জোরে-জোরে কথাগুলো বলছিল।

"মাথা গরম করছেন ভাই! মেয়েটার ঠিকানা বলুন, আপনাকে আরও আট হাজার পাইয়ে দেব। কাল বিকেল অবধি সময় দিলাম!" ফোন বন্ধ করল রফিক।

অমল হাসল, চমৎকার অভিনয় করেছে সে! রিজুলার ঠিকানা বলে দিলে ওরা ভাবছে পাঁচ লাখ আদায় করে নেবে আর তার বিনিময়ে ওকে আট হাজার দেবে। রফিক জানে না, তার পকেটে এখন আড়াই লাখ টাকা আছে! মনে হতেই সতর্ক হল সে। সামনে একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, তাতে উঠে বসল সে। মেট্রো সিনেমার হোর্ডিংয়ে অপরিচিত হিন্দি ছবির নায়িকার মুখ দেখে সোহাগের মুখ মনে এল। সোহাগ কেমন আছে এখন? ফোন করবে একবার? তারপরই ওর দাদার বলা কথাগুলো ভাবল সে। না, আজ ফোন করবে না সোহাগকে। কিন্তু সোহাগ তাকে ফোন করছে না কেন?

বাড়ির কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল অমল। তার নিজস্ব সঞ্চয় কমে আসছে। পকেটে অনেকগুলো ভাট আর আড়াই লাখ টাকা আছে। কিন্তু ওগুলো খরচ করা যাবে না। ভাট ফেরত দিয়ে দিতে হবে কাল। আড়াই লাখের সবগুলোই হাজার টাকার নোট। পাড়ার মুদির দোকানও ভাঙিয়ে দেবে না। রফিকের কথাগুলো তার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। পাঁচ লাখ টাকা কমে গিয়েছে, অথচ তার জন্য যতটা উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, তা রফিক হয়নি। তাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছে রিজুলার ঠিকানা জানানোর জন্যে। সে জানাতে পারবে না শুনেও চেঁচামেচি করেনি। পাঁচ লাখ টাকার মূল্য কি তেমন বেশি নয়? ওই টাকার জন্য মানুষ কত কী করতে পারে! ব্যাপারটা বলার জন্য সে রিজুলাকে ফোন করল। রিজুলার ফোন বন্ধ। হতাশ হল অমল।

বাড়িতে পৌঁছে মাকে শান্ত করে জামাপ্যান্ট ছেড়ে পায়জামা পরতে গিয়ে অসহায় বোধ করল অমল। প্যান্টের পকেটে টাকাটা আছে, ওই প্যান্ট আলনায় ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হবে না। ময়লা হয়ে গিয়েছে ভেবে মা যেমন কাচতে ফেলে দেয়, আজ তেমন দিলে হয়ে গেল। সে প্যান্টটা বের করে দেওয়ালের দিকে বিছানায় তোষকের নীচে ঢুকিয়ে দিল। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

বউদি এল চা আর বিস্কুট নিয়ে, "আবার কোথায় যাচ্ছ গো?"

"হরিদ্বার!" মুখ থেকে বেরিয়ে এল অমলের।

চায়ের কাপ টেবিলে রেখে বউদি চেঁচিয়ে উঠল, "মা, ও মা, তাড়াতাড়ি আসুন।"

মা চলে এল দ্রুত, "কী হল?"

"আপনার ছোট ছেলে হরিদ্বারে যাচ্ছে!" বউদি বলল।

"ও মা, কেন?"

"কেন আবার? অফিসের কাজে যাচ্ছে!" বউদি বলল, "আপনারা তো আমার বিয়ের আগে হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরিতে গিয়েছিলেন। ক'দিন আগেই বলছিলেন না, আর একবার যাওয়ার ইচ্ছে আছে? আমিও কখনও যাইনি। চলুন, আমরা ওর সঙ্গে ঘুরে আসি।"

মা বলল, "কিন্তু তোমার বরের কি হবে? ও কী যেতে পারবে?"

"না পারলে থেকে যাবে! হোম ডেলিভারি বললেই খাবার দিয়ে যাবে।"

মা বলল, "ওর সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো।"

বউদি ঘুরে দাঁড়াল অমলের দিকে, "কবে যাবে গো?"

"আগামী কাল," বলেই অমলের মনে হল, মা যদি গিয়ে খুশি হয়, তা হলে তার উচিত ওকে নিয়ে যাওয়া।

"সে কী! এত তাড়াতাড়ি!" বউদি কুঁকড়ে গেল, "ক'দিন পরে গেলে হয় না?"

"অফিস শুনবে না!" অমল বলল।

"বাব্বা! আমাদের টিকিট পাওয়া যাবে?"

"দাদাকে বলো। ওর সোর্স আছে।"

"তা হলেই হয়েছে!" বউদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা মাথা নাড়ল, "না রে! তুই তোর কাজ করে আয়। অনেক সময় আছে। পরে তোর সঙ্গে একবার যাব। ওখানে খুব স্রোত, জলে নামিস না।"

রাত দশটায় রিজুলার ফোন এল। কিন্তু এবার ল্যান্ড লাইন থেকে।

গলা শুনে অমল বলল, "তোমার ফোন তো বন্ধ! এটা কার ফোন?"

"দাদুর ল্যান্ড লাইন। খবর কী?"

"খবর হল, ওরা জেনে গিয়েছে! সন্দেহ করছে তোমাকে। আমাকে বলেছে, তোমায় খুঁজে বের করতে। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে!"

"তা হলে তো কালই কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়!" রিজুলা বলল।

"হরিদ্বারে যাবে?"

"হঠাৎ হরিদ্বার?"

"আমাকে মিস্টার আহমেদ কাল ওখানে পাঠাচ্ছেন।"

রিজুলা হাসল, "তোমার সঙ্গে আমি গেলে ওরা জানতে পারবেই।"

"কী করে?"

"আমার বিশ্বাস, ওরা তোমার উপর নজর রাখছে। তুমি এক কাজ করো। কাল সকাল সাড়ে ছ'টায় কোনও এসটিডি বুথ থেকে আমাকে ফোন কর। ওই সময় আমি মোবাইল অন রাখব," রিজুলা রিসিভার নামিয়ে রাখল।

অমলের অস্বস্তি বাড়ল! কাল হরিদ্বারে গেলে টাকার প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সেটা যে মোটেই নিরাপদ হবে না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

উদ্বেগ এবং উত্তেজনায় রাত চারটে থেকে ঘুম চটকে গেল অমলের! আবার ঘুমিয়ে পড়লে যদি সকাল সাড়ে ছ'টা বেজে যায়, সেই ভয়ে জেগেই বসে থাকল সে। এই বাড়িতে সকাল হয় সাতটার কাছাকাছি। তার আগে চা পাওয়ার কোনও চান্স নেই। পৌনে ছ'টা নাগাদ জামাপ্যান্ট পরে টাকার প্যাকেট পকেটে ভরে প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে চলে এল সে।

কলকাতার মানুষ কি দিন-রাত এক করে ফেলেছে, নইলে এই ভোরেও পথে মুখের অভাব নেই কেন? অমল হাঁটতে লাগল। তাদের পাড়াতেই একটা এসটিডি বুথ আছে। কিন্তু ওখানে ফোন করতে গেলে ছেলেটাই অবাক হয়ে যাবে! আজকাল মোবাইলের কারণে লোকাল তো বটেই, ভারতের অন্য শহরে ফোন করতেও খুব কম মানুষ এসটিডি বুথে যায়। সে যে বিদেশের কাউকে ফোন করছে না জেনে ছেলেটা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে তার মোবাইল খারাপ কিনা! কী দরকার।

হেঁটে সোজা বাগবাজারের মোড়ে চলে এল সে। এখনও পনেরো মিনিট বাকি। একটা এসটিডি বুথ খোলা দেখতে পেয়ে সামনের চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা কিনে চুমুক দিতে-দিতে দেখল হাফপ্যান্ট-বারমুডা আর কেডস পরা মর্নিং ওয়াকাররা দ্রুত চলে যাচ্ছে। এদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কম নয়। মাথা নাড়ল অমল চায়ে চুমুক দিয়ে। মানুষ এখন বেশ স্বাস্থ্যসচেতন হয়েছে। তারও উচিত ছিল, ভোরে উঠে এই ভাবে হাঁটাহাঁটি করা। ভাবতেই হেসে ফেলল অমল। তার তো কত কী করা উচিত ছিল, কোনটা করেছে? পড়াশোনোটাও যদি সিরিয়াসলি করত...মোবাইলে সময় দেখল সে, তারপর এসটিডি বুথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখনও পাঁচ মিনিট দেরি আছে।

"ফোন করবেন? মোবাইল খারাপ নাকি?" বুথের বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

সাতসকালে মিথ্যে বলল অমল, "হ্যাঁ, খারাপ।"

"তা হলে আসুন।"

"একটু দেরি আছে।"

"মানে?"

"এখনও ট্রেন স্টেশনে পৌঁছয়নি।"

"ও! কারও মোবাইলে করবেন মনে হচ্ছে? ল্যান্ডে কল করলে পঁচাত্তর পয়সা, মোবাইলে এক টাকা।"

"ঠিক আছে।"

কাচের ঘরে ঢুকে ঠিক সাড়ে ছ'টায় রিজুলাকে ফোন করল অমল। ফোন খোলা রেখেছে রিজুলা, রিং হচ্ছে।

"বাঃ, তোমার টাইম সেন্স তো খুব ভাল। থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি এখন কোথায় আছ?"

"বাগবাজারে। তোমায় ফোন করতে এসেছি।"

"ও! তুমি আজ হরিদ্বার চলে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। কাজ করতে হলে ওদের কথা শুনতেই হবে।"

"তোমার ইচ্ছে কাজটা করার, তাই তো?"

"না করে উপায় নেই। রোজগার তো করতে হবে।"

"তা হবে। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, প্রতিটি ট্রিপে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ জিনিস আনতে হবে। ধরো, এবার হরিদ্বারে গিয়ে তুমি যে প্যাকেট পাবে, তার ভিতরে দু' কেজি গাঁজা আছে! দু'-তিন হাজারের জন্য ওই প্যাকেট কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে তোমাকে। ধরা পড়লে অন্তত ছ' বছর জেলে থাকতে হবে। আমি তোমাকে বলেছিলাম, এসো, ব্যবসা করি। কোনও অসৎ ব্যাপার নয়, খেটে রোজগার করব। এখন তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই করবে।"

রিজুলার কথা শুনে মেরুদণ্ডে চিনচিনে অনুভূতি ছড়াল। অমল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"ভাবছি, বেঙ্গালুরু যাব।"

"কেন?

"এত জায়গা থাকতে ওখানে আমার খোঁজ কেউ করবে বলে মনে হয় না। যে ব্যবসার কথা মাথায় এসেছে, তা একা করা একটু অসুবিধের। তুমি যাবে?" আচমকা প্রশ্ন করল রিজুলা।

"তোমার ট্রেনের টিকিট হয়ে গিয়েছে?"

"না।"

"তা হলে টিকিট পাবে কী করে?"

"দেখা যাক। ঠিক এগারোটায় হাওড়া-যশবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। টি টি-র সাহায্য নিতে হবে। অমল, ফোনে যোগাযোগ রেখো। রাখছি এখন," রিজুলা ফোন বন্ধ করে দিল।

একটা সুটকেসে দুটো শার্ট, একটা প্যান্ট আর টুথব্রাশ, পেস্ট, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় মা বলল, "হ্যাঁ রে, মোবাইলের চার্জার নিয়েছিস তো?"

একদম খেয়াল ছিল না, নিয়ে নিল ওটা। খানিক আগে তার যাবতীয় টাকা এক করে গুনে দেখেছে, তেরশো পঁচিশ টাকা পড়ে আছে। আড়াই লক্ষ টাকার কথা ভুলে থাকাই ভাল! মিস্টার আহমেদ নিশ্চয়ই হরিদ্বারের টিকিটের সঙ্গে থাকা খাওয়ার খরচ দেবেন। তখন জেনে নিতে হবে এই ট্রিপে সে কত টাকা পাবে! ট্যাক্সি নিয়ে খিদিরপুরে পৌঁছতেই একশো টাকা বেরিয়ে গেল।

এখন সকাল ন'টা চল্লিশ।

মিস্টার আহমেদ অমলকে দেখে অবাক হলেন, "এ কী! তোমাকে বলেছিলাম সকাল দশটার সময় আমাকে ফোন করতে, আসতে বলিনি।"

"আপনি বলেছিলেন, একটার সময় উপাসনা এক্সপ্রেসে যেতে হতে পারে, তাই তৈরি হয়ে চলে এলাম," পকেট থেকে ব্যাঙ্কক-ফেরত ভাটগুলো আর তার হিসেব লেখা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল অমল।

"তোমার তো খুব সামান্যই খরচ হয়েছে, গুড!" হাসলেন মিস্টার আহমেদ, "এটা ম্যাডামকে জানাতে হবে। ওয়েল, অমল, তোমাকে আজ হরিদ্বারে যেতে হচ্ছে না। যদিও এই ব্যাঙ্কক ট্রিপে তুমি খুব পুওর রেজাল্ট করেছ, তবু তোমাকে আর একটা সুযোগ দিতে চাই। সামনের সপ্তাহের শেষে তোমাকে হংকং-এ যেতে হতে পারে। পাসপোর্ট সঙ্গে আছে?"

কী খেয়াল হল, মাথা নেড়ে 'না' বলল অমল।

খুব বিরক্ত হলেন মিস্টার আহমেদ, "ইন্ডিয়ানরা, বিশেষ করে তোমরা বাঙালিরা পাসপোর্টের গুরুত্ব বোঝো না! সব সময় ওটা সঙ্গে রাখবে। কাল ফোন করে আমি আছি জানলে ওটা দিয়ে যাবে। হংকং-এর প্লেনে তো তোমার মুখ দেখে তুলবে না, পাসপোর্টে ভিসার ছাপ চাই! ভবিষ্যতে এসব কথা যেন আর বলতে না হয়," ড্রয়ার থেকে চারটে পাঁচশো টাকার নোট বের করে মিস্টার আহমেদ বললেন, "পারফরম্যান্স খুব খারাপ। তবু ম্যাডাম তোমাকে দু' হাজার টাকা দিতে বলেছেন। একটা ভাল শার্ট কিনে নিও।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"এখন তুমি যেতে পার।"

সুটকেস নিয়ে নীচে নেমে এসে মোবাইলে সময় দেখল সে, দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। তার পকেটে বারোশো পঁচিশের সঙ্গে আরও দু' হাজার যোগ হয়েছে! আঃ, কী আরাম। ম্যাডামকে মনে-মনে ধন্যবাদ জানাল। আজ তাকে হরিদ্বার যেতে হচ্ছে না। রিজুলার কথাই ঠিক। ওকে নিশ্চয়ই গাঁজার প্যাকেট নিয়ে আসতে হত! কিন্তু হংকং তো ভাল জায়গা নয়। সে কাগজে পড়েছে, হংকং নাকি চোরাকারবারিদের স্বর্গ। সামনের সপ্তাহে ওখানে গিয়ে হয়তো ড্রাগ বা চরস নিয়ে আসতে হবে। ধরা পড়লেই জেলে থাকতে হবে! পকেটে আড়াই লক্ষ টাকা থাকতে অন্যের জন্য এই ঝুঁকি কেন নেবে সে? সঙ্গে-সঙ্গে খেয়াল হল, আজ রফিক তাকে এখনও ফোন করেনি। বিকেলে সক্রিয় হবে লোকটা। তার আগে কলকাতা থেকে সরে পড়লে কেমন হয়?

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অমল। জীবনে এই প্রথমবার এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সে। এই অফিস-সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া ভাগ্যের কথা। প্রায় দশ পনেরোতে একটাকে পাওয়া গেল। দিনদুপুরে হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য দশ টাকা বেশি চাইল লোকটা। অন্য সময় হলে সে ঝগড়া করত। কখনওই উঠত না ট্যাক্সিতে। কিন্তু আজ সময় নেই। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে রিজুলার ট্রেন ছেড়ে যাবে। সে ট্যাক্সিতে উঠে বলল, "বেশি টাকা নিচ্ছেন, তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিন।" লোকটা হাসল, "বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি পৌঁছাব। কিন্তু ভাই, এখনকার বাজারে দশ টাকাকে বেশি টাকা বলছেন? ওটা এখন টাকাই নয়।" কথা বাড়াল না অমল।

আধঘন্টায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেই খেয়াল হল। রিজুলা এসেছে তো? সে ওর মোবাইলে ফোন করে শুনল, সুইচড অফ! ঘাবড়ে গেল অমল। নিশ্চয়ই স্টেশনে আসেনি রিজুলা। তা হলে বেঙ্গালুরুর টিকিট কাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? টিকিট কেটেও তো ফেরত দিতে হতে পারে। সে একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকল, তখন আর বারো মিনিট সময় আছে! বিশাল ট্রেন। শেষ পর্যন্ত দেখতে গেলে দশ মিনিট চলে যাবে। তবু সুটকেস হাতে প্রায় দৌড়ের ভঙ্গিতে কামরার জানলাগুলো দেখতে-দেখতে এগিয়ে গেল অমল।

"অ্যাই, দাঁড়াও!" রিজুলার গলা।

যদিও হাঁফাচ্ছিল, তবু অমলের মনে হল তার ধড়ে প্রাণ এল! কোনও রকমে সে জিজ্ঞেস করল, "ফোন বন্ধ কেন?"

মাথা নাড়ল রিজুলা। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি হরিদ্বারে যাচ্ছ? কখন ট্রেন?"

"হরিদ্বারে নয়, বেঙ্গালুরু যাওয়ার জন্য এসেছি।"

"সত্যি?" রিজুলার মুখ-চোখে খুশি ছড়িয়ে গেল, "ওঃ, আমি এখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, যদি তুমি আস..." অমলের হাত ধরল রিজুলা, "আমি খুব খুশি হয়েছি। খুব। দাঁড়াও।"

অমল দেখল, রিজুলা দ্রুত কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের কাছে চলে গেল। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল কয়েকজন। কিন্তু রিজুলা ভদ্রলোককে একপাশে টেনে নিয়ে এসে কিছু বলল। ভদ্রলোক বারংবার ঘাড় নেড়ে না বলছিলেন। কিন্তু রিজুলা তাঁকে ছাড়ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক বুড়ো আঙুলে ইশারা করে কামরায় উঠতে বললেন।

রিজুলা এসে বলল, "চলো, পা রাখার অনুমতি যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন বসারও পাওয়া যাবে। আর কে না জানে, বসতে জায়গা পেলেই শোওয়া যাবে?"

"তোমার টিকিট?"

"প্রতিশ্রুতিতে আছি!"

"তার মানে?"

"ভদ্রলোক বলেছেন, আপাতত ট্রেনে উঠে কোনও খালি বার্থ পেলে বসতে। উনি কামরা চেক করার পর বলতে পারবেন আমি কোনটা পাব," রিজুলা হাসল, "তুমি যখন এসেছ তখন ঠিক পেয়ে যাব। উঠে পড়।"

ওরা দরজা পেরিয়ে বেসিনের কাছে যাওয়া মাত্র ট্রেন নড়ে উঠে যাত্রা শুরু করল। অমল বলল, "আমাকে যদি নামিয়ে দেয়?"

"এই ট্রেন বহু স্টেশন পেরিয়ে কোনও বড় জায়গায় থামে। এখনই ওই চিন্তা করার কি দরকার, হাতে তো সময় আছে!" রিজুলা বলল।

ট্রেন ছুটছে। কন্ডাক্টর গার্ড ভিতরে ঢুকে গিয়েছেন চার্ট হাতে নিয়ে।

রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "হরিদ্বারের ব্যাপারটা কী হল?"

"ওটা ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে।"

"যাক, বাঁচা গেল! তুমি যে স্টেশনে এসেছ, কেউ ফলো করেনি তো?"

"না বোধ হয়। আমার ট্যাক্সির পিছনে কোনও গাড়ি ছিল না," অমল বলল, "বিদ্যাসাগর সেতু হয়ে এসেছি," কথাগুলো বলেই খেয়াল হল অমলের, "শোনো, আমি শেষ মুহূর্তে স্টেশনে এসেছিলাম, তোমার ফোন বন্ধ, তুমি এসেছ কিনা বুঝতে পারছিলাম না, তাই টিকিট কেনার সুযোগ পাইনি।"

"সর্বনাশ?" রিজুলার মুখ থেকে শব্দটা ছিটকে বের হল।

"কী হবে? ভদ্রলোককে বলবে? আমি একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটেছি।"

"প্ল্যাটফর্ম টিকিট? ওটা তো প্ল্যাটফর্মে ভ্যালিড, ট্রেনে নয়।"

"তা হলে কি পরের স্টেশনে নেমে যাব?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"তুমি একটা ভিতুর ডিম!" হাসল রিজুলা, "সমস্যায় পড়লেই এত নার্ভাস হও কেন? যখন যা হওয়ার তা হবে। এখন ভিতরে চলো।"

"ভিতরে কোথায় বসবে?"

"যেখানে আমার জিনিস রেখেছি।"

থ্রি-টিয়ার এসি কামরার ভিতরটা চমৎকার ঠান্ডা। প্যাসেজের ধারে একটা সিটের উপর থেকে সুটকেস সরিয়ে রিজুলা বলল, "বোসো।"

অমল দেখল, ব্যাঙ্কক থেকে নিয়ে আসা সেই ঢাউস সুটকেসটা এখন বেঙ্গালুরু চলেছে। উল্টো দিকের ছ'জন যাত্রীদের মধ্যে দু'জন মহিলা। তারা রিজুলাকে দেখছে। কিন্তু রিজুলা যে তাদের পাত্তা দিচ্ছে না, তা ওর মুখের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "তুমি বাড়িতে বলে এসেছ?"

"ওরা জানে, আমি হরিদ্বার যাচ্ছি।"

"তা হলে তো দু'দিন বাদেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে।"

একটু ভাবল অমল। এই ব্যাপারটা নিয়ে সে কিছুই ভাবেনি। বলল, "তেমন হলে ফোনে জানিয়ে দেব।"

"ও! তোমার ফোন কি চালু আছে?"

"হ্যাঁ," মোবাইল বের করে বন্ধ করতে যাচ্ছিল অমল, রিজুলা বাধা দিল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওই মেয়েটির খবর নিয়েছ?"

বুঝতে না পেরে তাকিয়েই মনে হল, সোহাগের কথা বলছে রিজুলা। বলল, "এত ঝামেলা যে, সময় করে উঠতে পারিনি।"

"খবরটা নিয়ে ফোন অফ করে দাও।"

সোহাগের নম্বর টিপল অমল। দরজা জানলা বন্ধ থাকার জন্য রিং স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ বেজে থেমে গেল শেষ পর্যন্ত। উদ্বিগ্ন হয়ে শোভনকে ফোন করল অমল। দু'বার রিং হতেই শোভনের গলা শুনল, "হ্যালো!"

"শোভন, অমল বলছি। সোহাগ কেমন আছে রে?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করছিস?"

"আমি ফোন করেছিলাম, রিং হয়ে গেল, ও ধরল না।"

"সোহাগ এখন আইসিইউ-তে আছে।" শোভন গম্ভীর গলায় বলল।

"সে কী!"

"প্রচুর রক্ত বেরিয়েছিল নাক দিয়ে। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার পর দু' বোতল রক্ত দেওয়া হলেও, শি ইজ নট আউট অব ডেঞ্জার। আমি কাল রাতে কলকাতায় চলে এসেছি।"

"শোভন, ডাক্তার কী বলছে?" গলা শুকিয়ে গিয়েছিল অমলের।

"ওয়াচ করছে। অমল, তোকে একটা রিকোয়েস্ট করছি। আমি বুঝতে পারছি, তোর খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু তুই সোহাগকে দেখতে নার্সিংহোমে আসিস না। জানি না কেন, মা তোকে স্ট্যান্ড করতে পারছে না।" লাইন কেটে দিল শোভন।

পাথরের মতো বসে রইল অমল।

সেটা লক্ষ করে রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"অ্যাঁ?" মুখ ফেরাল অমল। তারপর বলল, "সোহাগ এখন আইসিইউতে। ডাক্তাররা ওয়াচ করছেন। ওর দাদা শোভন চলে এসেছে কলকাতায়।"

"তুমি কি কলকাতায় ফিরে যেতে চাও?"

"না," মাথা নাড়ল অমল, "আমি গিয়ে তো কিছুই করতে পারব না। তা ছাড়া শোভন বলল, ওর মা আমাকে সহ্য করতে পারছেন না! হয়তো ভাবছেন, আমার জন্য উত্তেজিত হয়েই..." কথা শেষ করল না অমল।

"মন শক্ত করো। সোহাগ নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।"

"না। ওর যা অসুখ, তা ভাল হওয়ার নয়। কিন্তু ও যদি আমার কথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে থাকে, তা হলে নিজেকে ক্ষমা করব কী করে?"

"আচ্ছা পাগল তো! তুমি জানলে কী করে, সোহাগ তোমার কথা ভেবে উত্তেজিত হয়েছে? তুমি বলেছ, তোমাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়নি। তোমরা খুব ভাল বন্ধু। কেউ যদি কোনও কল্পনা করে নিজে-নিজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তা হলে তুমি কী করতে পার! মাথা থেকে সরাও ব্যাপারটা।" রিজুলা বলল।

কন্ডাক্টার গার্ডের সৌজন্যে শেষ পর্যন্ত ওরা দুটো বার্থ পেল। রিজুলা তার টিকিট দিয়ে বলল, "ওর জন্য ফ্রেশ টিকিট করে দিতে হবে।"

"ফ্রেশ টিকিট মানে?" ভদ্রলোক হকচকিয়ে তাকালেন।

"ওর টিকিট পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে।"

"মাই গড! তা হলে তো পেনাল্টি দিতে হবে।

"পেনাল্টি কেন? ও তো টিকিট কিনেছিল!"

"প্রমাণ আছে? প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেও একটা টিকিট লাগে। সেটা থাকলেও না হয় পেনাল্টি মকুব করা যেত!"

"হ্যাঁ। প্ল্যাটফর্ম টিকিট আছে। দেখাও তো।"

রিজুলার কথায় অমল প্ল্যাটফর্ম টিকিট ভদ্রলোককে দিল।

ভদ্রলোক সেটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বেঙ্গালুরুর টিকিট কাটার সঙ্গে-সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটেছেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

"যখন দেখল, টিকিটটা হারিয়ে গিয়েছে, তখন প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনেছিল। টাকা তো আমার কাছে, ওর কাছে বেশি না থাকায় আবার কী করে বেঙ্গালুরুর টিকিট কাটবে?" রিজুলা যেন জিজ্ঞেস করল।

"আপনি কি ওকালতি করেন?" ভদ্রলোক হাসলেন।

"না, কেন?"

"করলে ভাল পসার হত! ওকে তো কথা বলতেই দিচ্ছেন না। নিজেই গল্প তৈরি করছেন!"

সব কিছু আইনসম্মতভাবে করে দিয়ে ভদ্রলোক মাত্র পাঁচশো টাকা দক্ষিণা নিলেন। যেখানে বসে এসব কথা হচ্ছিল, সেখানে আরও দু'জন যাত্রী ছিল। তারা অবাঙালি। একজন জিজ্ঞেস করল, "কত দিতে হল?"

রিজুলা বলল, "টিকিটের যা দাম, তাই!"

শুনে লোকটি হতাশ হল।

ওরা বেঙ্গালুরু পৌঁছল বিকেল চারটের পরে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "এখানে আগে এসেছ?"

"না।"

"আমিও আসিনি। গতকাল দাদুর আলমারি থেকে 'ভারত গাইড' বইটা পড়ে খানিকটা জেনেছি। কিন্তু ভাড়া দিয়ে দেওয়ার পর আমার পকেট প্রায় খালি হয়ে এসেছে। অবশ্য সুটকেসে আড়াই আছে," রিজুলা বলল।

"আমার কাছে তিন হাজারের উপর আছে!" অমল বলল।

"বাঃ, সুখবর! তা হলে আমরা ট্যাক্সি নিই।"

"অটো নিলে হয় না? সস্তা পড়বে," অমল বলল।

"তাই হোক।"

অনেক দরাদরি করার পর একটা অটো গাঁধীনগরে যেতে রাজি হল।

অটো চলতে শুরু করলে অমল জিজ্ঞেস করল, "গাঁধীনগর কেন?"

"বইতে পড়লাম, জায়গাটা বেশ ভাল। অনেক হোটেল আছে," রিজুলা বলল, "বেঙ্গালুরুর আবহাওয়া কলকাতার চেয়ে ভাল, তাই না?"

"হ্যাঁ, গরম নেই।"

গাঁধীনগরে পৌঁছে অটোওয়ালা জানতে চাইলে রিজুলা হোটেলের নাম বলল, 'তিরুপতি কমফর্ট ইন।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে রেসকোর্স পেরিয়ে হোটেলে পৌঁছে গেল অটো রিকশা। ভাড়া মিটিয়ে রিসেপশনে গিয়ে ওরা জানল, ঘর পাওয়া যাবে। ডবল বেড ঘরের ভাড়া প্রতিদিন এক হাজার চল্লিশ টাকা! হাজার টাকা অগ্রিম দিতে হবে। রিজুলার কথায় নাম-ঠিকানা লিখতে যাচ্ছিল অমল।

শেষ মুহূর্তে রিজুলা বলল, "কমল, মিস্টার-মিসেস লিখতে ভুলো না।"

ঢোঁক গিলল অমল। তারপর লিখল, 'মিস্টার মিসেস কমল চৌধুরী।' বাড়ির ঠিকানাও বদলে দিল।

বেয়ারা মালপত্র ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেলে হাসতে লাগল রিজুলা, "তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর এই প্রথম তোমাকে স্মার্ট হতে দেখলাম। এক লহমায় ইশারা বুঝতে পারলে!"

অমল হাসল, "আমার দাদার নাম কমল।"

"এমনিতেও কেউ কিছুই ভাবত না। তবুও মিস্টার-মিসেস লেখায় কারও কৌতূহল হবে না। শোনো, আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে আপত্তি নেই তো?" হাসতে-হাসতে রিজুলা জিজ্ঞেস করল।

"তোমার যখন আপত্তি নেই..."

সুটকেস খুলল রিজুলা, "আমি আগে স্নান সেরে আসছি। সুটকেস খোলা রইল। এর মধ্যে আমাদের প্রাণভোমরা আছে!"

"তুমি যখন বাথরুমে স্নান করবে, তখন যদি ওটা নিয়ে আমি পালিয়ে যাই?" অমল হাসল।

উত্তর না দিয়ে সালোয়ার-কামিজ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রিজুলা। তারপর কোনও কথা না বলে বাথরুমে চলে গেল।

রিজুলাকে খুব ভাল লেগে গেল অমলের। ঠিক এরকম ভাল লাগা সোহাগের সঙ্গে কথা বলতে বা ওর কথা ভাবলে কখনও মনে আসেনি। সোহাগকে সে খুব পছন্দ করে। ওর কাছে গেলে মন হালকা হয়ে যায়। ওর কথা শুনলে কষ্ট কমে যায়। ওর কথা যখনই ভাবে, তখনই একটা তীব্র স্নেহবোধ মনে তৈরি হয়! সোহাগ অনেকটা মায়ের ঠাকুরঘরের মতো। গিয়ে বসলে মন ভাল হয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুরঘরে সারা জীবন দূরের কথা, চব্বিশ ঘণ্টাও বসে থাকা যায় না!

এই যে সে বেঙ্গালুরু চলে এসেছে, তা কলকাতার কেউ জানে না। মা বা বউদিও না। সোহাগকে জানানোর সুযোগই পাওয়া যায়নি। কাজে এসেছে শুনলে সোহাগ মেনে নিত। কিন্তু রিজুলার সঙ্গে টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছে জানলে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে আরও অসুস্থ হত! কাঁহাতক একটা মানুষের মন এবং স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য অবতার হয়ে থাকা যায়! তাই মিথ্যে বলে সোহাগকে খুশি রাখতে হত। সোহাগ খুশি থাকলে তার মন ভাল থাকে। এই পর্যন্ত।

রফিক কি গতকাল তার বাড়িতে গিয়েছিল? ফোন সুইচড অফ শুনে খেপে গিয়েছে? পাঁচ লাখ টাকা হারিয়ে কেউ চুপচাপ থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই বাড়িতে খবর নিতে গিয়ে শুনেছে, সে হরিদ্বারে গিয়েছে! শুনে রফিক যদি মিস্টার হককে জানায়, তা হলে তিনি কি মিস্টার আহমেদকে ফোন করবেন? অমল হরিদ্বারের কোথায় আছে জানতে চাইবেন? অমলের মনে হল, এই কাজটা ওরা কখনওই করবে না। মিস্টার আহমেদ তা হলে কারণ জানতে চাইবেন, যা ওদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়!

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রিজুলা। নীল সালোয়ার-কামিজে ওকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। রিজুলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই, ওভাবে কী দেখছ?"

"তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে!" অমল বলল।

"এর পরের সংলাপ হবে, 'রিজুলা, আই লাভ ইউ'!" হাসল রিজুলা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "যাও, স্নান করে এসো। ভিতরে তোয়ালে আছে।"

স্নান সেরে খেয়াল হল, গাল গড়গড় করছে। কিন্তু এই সন্ধেবেলায় ওটা কামিয়ে ফেলার ইচ্ছেই হল না।

রিজুলা খাটে বসেছিল। বলল, "চা-স্যান্ডউইচ আসছে। রাতেও ঘরেই খেয়ে নেব। কী বলো?"

"ঠিক আছে।"

"তুমি কি আবার খোঁজ নেবে?"

"কীসের?"

"ওঃ! সেই মহিলা এখন কেমন আছেন?"

শোভনকে ফোন করল অমল। করে হতাশ হল। ওর ফোন বন্ধ।

চা খাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে রিজুলা বলল, "দিনপাঁচেকের মধ্যে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হবে। এত খরচ করে বেশিদিন থাকা যাবে না। আমি আমার আড়াই লাখ টাকা থেকে খরচ করছি। ধরো, আমরা বাড়ি ভাড়াসমেত দু' মাসের খরচ যদি পঞ্চাশ হাজার রাখি, তা হলে থাকবে সাড়ে চার লাখ। দুই থেকে আড়াই লাখের মধ্যে ব্যবসার ক্যাপিটাল রাখতে তোমার আপত্তি নেই তো?"

"কীসের ব্যবসা?"

"অনেকগুলো মাথায় আছে। পরে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।"

"আমি ব্যবসার কিছুই বুঝি না।"

রিজুলা উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তুমি কী-কী বোঝ, তা যদি আমাকে বল, তা হলে খুব সুবিধে হয়!"

অমল হেসে ফেলল, "আমি কিছুই বুঝি না।"

"দ্যাট্‌স গুড!" বলে টিভির সুইচ অন করল রিজুলা।

সন্ধেটা কেটে গেল টিভি দেখে। কলকাতার চ্যানেলগুলোর কয়েকটা হোটেলে রেখেছে। সেগুলো না দেখে রিজুলা ওয়াইল্ড লাইফের চ্যানেল দুটো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে গেল।

রাতের খাওয়ার পরে দরজা বন্ধ করে রিজুলা বলল, "আচ্ছা অমল, আমাকে তোমার কী মনে হয়?"

"ভাল!" অমল তার খাটে বসেছিল।

"আমাকে কি মহিলা বলে মনে হয় না?"

"অবশ্যই। এটা কি প্রশ্ন করতে হবে?"

"একজন মহিলা ঘুমিয়ে পড়লে তার দিকে তাকানো উচিত নয়।"

"একথা আমাকে বলছ কেন?"

"বলছি, যাতে তুমি না তাকাও! আমি নাইটি না পরে ঘুমোতে পারি না। ঘুমোলে সেটা সর্বাঙ্গ আড়াল করে রাখে না, তাই!" সুটকেস থেকে নাইটি বের করে বাথরুমে চলে গেল রিজুলা।

অদ্ভুত মেয়ে! অমল মাথা নাড়ল। এত খোলাখুলি কথা যে-কোনও মেয়ে বলতে পারে, তা ধারণার বাইরে ছিল তার। যদিও কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে সে এক ঘরে রাত কাটায়নি, কাটানোর কথা কল্পনায় আসেনি। সোহাগের সঙ্গে এত দিন ধরে গল্প করে এসেছে, একবারও মনে হয়নি একসঙ্গে রাতে থাকার কথা! তার আয় ছিল অতি সামান্য, বিয়ের কথা চিন্তার বাইরে ছিল। মা-বউদিও ভাবত না। আজ সে প্রথমবার একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সারা রাত এক ঘরে থাকবে। হঠাৎই উত্তপ্ত হল সে! কিন্তু তার পক্ষে রিজুলার সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার করা সম্ভব নয়। যাতে না করে, তার জন্য রিজুলা সতর্ক না করলেও চলত। কারণ, রিজুলার সব কিছু আকর্ষক হলেও, ওর চারপাশে বরফের দেওয়াল তুলে রেখেছে! যেখানে স্পর্শ করলে কুঁকড়ে যেতে হবে।

রিজুলা বেরিয়ে এলে চমকে গেল অমল। স্লিভলেস লাল নাইটিতে ওকে ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখাচ্ছে! আগুনের শিখার মতো হেঁটে গেল সে নিজের বিছানার দিকে। চোখ সরিয়ে নিল অমল।

"কী হল? আমি তো এখনও জেগেই আছি, ঘুমাইনি!" রিজুলা বলল।

"আমার ঘুম পাচ্ছে," অমল শুয়ে পড়ল দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

আলো নিভিয়ে দিল রিজুলা। চোখ বন্ধ করল অমল, ঘুম চাই, ঘুম!

সাতসকালে অমলকে ডেকে তুলল রিজুলা, "উঠে পড়ো। হাঁটতে বের হবা।"

"হাঁটতে?" ধড়মড়িয়ে উঠে বসল অমল।

"এই সময়টায় আরাম করে হাঁটা যাবে।"

"দূর! আমার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না।"

"কী ইচ্ছে করছে? ঘুমাতে?"

খাট থেকে নেমে বাথরুমে গেল অমল। পরিষ্কার হয়ে ফিরে এসে বলল, "আগে চা খাব, তারপর দু'জনে বসে পরিকল্পনা করব।" দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এল অমল।

রিজুলা অবাক হয়ে দেখছিল। এই অমলকে যেন সে চেনে না। ঘুম থেকে উঠে যেন পাল্টে গিয়েছে ছেলেটা। এত দিন রিজুলা যা বলেছে, তাই বাধ্য ছেলের মতো শুনেছে। আজ যেন ও নিজের ইচ্ছেটাই তাকে মানতে বলছে।

চেয়ারে বসে অমল বলল, "তুমি কাল যে ব্যবসার কথা বললে, সেটা কী ধরনের ব্যবসা? এই শহরের কিছুই আমি বা তুমি চিনি না। তা হলে কী ভাবে ব্যবসা করব?"

"গুড!" হাসল রিজুলা, "প্রথমে আমরা একটা ফ্ল্যাট বা বাড়ি ভাড়া নেব। তারপর বেশ পুরনো অথচ চালু রয়েছে, এমন একটা মারুতি ভ্যান কিনে নেব। হাজার সত্তর-আশিতেই পাওয়া যাবে। কোনও গ্যারাজে গিয়ে সেই ভ্যানের একটা দিক কেটে দরজা তৈরি করে ভিতরের সিট তুলে দিয়ে শেল্‌ফ তৈরি করে নিতে হবে। তারপর খুঁজতে হবে এখানকার হাউজিং এস্টেটগুলোর কোনগুলোতে বাঙালিরা বেশি সংখ্যায় থাকেন।"

কথার মধ্যে চা-টোস্ট এসে গেল। বেয়ারা চলে গেলে টোস্টে কামড় দিয়ে অমল বলল, "এখনও আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না।"

চায়ে চুমুক দিয়ে রিজুলা বলল, "এখানকার বেশিরভাগ বাঙালি স্বামী-স্ত্রী, শুনেছি, চাকরি করেন। সকাল ন'টায় তাঁদের অফিসে যেতে হয়। আমরা ওই সব হাউজিংয়ে সুন্দর লিফলেটের মাধ্যমে জানাব যে, সকাল পৌনে আটটায় বাঙালি লাঞ্চ হাউজিংয়ে পৌঁছে যাবে। নিরামিষ এবং আমিষ। প্রথম একটু সন্দেহ করলেও ওঁরা যখন দেখবেন, শুক্তো থেকে চাটনি ঘরে বসে রিজনেব্‌ল দামে পাচ্ছেন, তখন আমরা সাপ্লাই দিতে হিমসিম খাব! তুমি কি জান, খাবারে লাভের পার্সেন্টেজ কতটা?"

"বুঝলাম। কিন্তু রাঁধবে কে?" অমল চায়ে চুমুক দিল।

"এখানে নিশ্চয়ই বাঙালি কুক আছে। তা ছাড়া আমিও সাহায্য করব।"

"বাজার করবে কে?"

"তুমি!"

"রাত তিনটে থেকে রান্না করতে হবে।"

"সকাল ন'টার পর সারাদিন বিশ্রাম!"

"খাবার বিক্রি করতে হলে সরকারের পারমিশন লাগতে পারে।"

"ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও," রিজুলা বলল।

"তুমি ওই ভ্যানে খাবার নিয়ে হাউজিংয়ে যেতে চাইছ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সসপ্যানে খোলা খাবার নয়, প্লাস্টিকের বাক্সে সুন্দরভাবে খাবার নিয়ে যাব আমরা।"

"কত লোককে কাস্টমার হিসেবে এক্সপেক্ট করছ?"

"দিনদশেকের মধ্যে অন্তত দু'শো ছাড়িয়ে যাবে।"

"কত লাভ হবে?"

"প্রথম দিকে কম হলেও মাসখানেকের মধ্যে দিনে দু' হাজার তো হবেই!"

"তার মানে, আমাদের যা ক্যাপিটাল, তার দ্বিগুণের বেশি টাকা এক বছরের মধ্যে পেয়ে যাব। কিন্তু রিজুলা, এই ব্যবসা খুব পরিশ্রমের এবং রান্না যদি কোনও কারণে ভাল না হয় তা হলে..."

"ওটা খারাপ হবে না!"

"এখানে বাঙালি রেস্তরাঁ নেই?"

"জানি না। আছে নিশ্চয়ই।"

"আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের এমন একটাও জায়গা খুঁজে বের করা যাবে না, যেখানে বাঙালিরা যায় অথচ বাঙালি খাবারের রেস্তরাঁ নেই। আমি মায়ের সঙ্গে হরিদ্বারে যখন গিয়েছিলাম, তখন দিদির হোটেল বা বউদির হোটেলে খেয়েছিলাম। মনে আছে, খুব ভিড় হত!" অমল বলল।

"তা হলে তো কেরলে যেতে হয় অথবা গোয়ায়!" রিজুলা বলল।

"গোয়াতে নিশ্চয়ই কেউ না-কেউ খুলে ফেলেছে।"

"দাঁড়াও, ভাবি। এখন চলো, তৈরি হয়ে নীচে নামি। হোটেলে না থেকে ফ্ল্যাট ভাড়া করার জন্য দালালের খোঁজ করি," রিজুলা বলল।

"আমরা যদি এখানে না থাকি, তা হলে ফ্ল্যাট ভাড়া করব কেন? এই হোটেলে থেকেই খোঁজ খবর নেওয়া যাক!" অমল বলল।

বেয়ারা এল চায়ের ট্রে নিতে। বলল, "আপনারা কি আজ চলে যাচ্ছেন?"

"কেন?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"না গেলে রিসেপশনে অ্যাডভান্স জমা দিয়ে যাবেন," লোকটা চলে গেল।

অমল রেগে গেল, "অদ্ভুত তো! এরা কি কাউকে বিশ্বাস করে না!"

"যদি এটা নিয়ম হয়, তা হলে মানতেই হবে।"

বেরবার সময় সুটকেস থেকে প্যাকেট বের করে দুটো হাজার টাকার নোট বের করে নিল রিজুলা। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোমার টাকা কোথায় রেখেছ?"

"পকেটে।"

"সাহস তো খুব!"

"হোটেলে রেখে যাচ্ছ, চুরি হয়ে গেলে তো কাউকে বলতেও পারবে না। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে জবাব দেওয়া যাবে না, এত টাকা কেন এনেছি।"

থমকে দাঁড়াল রিজুলা। একটু ভাবল। তারপর সুটকেস থেকে প্যাকেটটা তুলে নিজের হাতব্যাগে রেখে দিল, "তুমি খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছ!"

"কীরকম?"

"এত প্র্যাক্টিক্যাল কথা গতকাল অবধি বলোনি!"

রিসেপশনে গিয়ে রিজুলা হাজার টাকার নোটটা জমা দিল।

"আপনারা যদি বেড়াতে যেতে চান, তা হলে হোটেলের গাড়ি নিতে পারেন," রিসেপশনিস্ট নোটটা রেখে দিয়ে রসিদ দিল।

"না, আমরা বেড়াতে আসিনি। কাজে এসেছি। কয়েক মাস এই শহরে থাকব। ফ্ল্যাট ভাড়ার খবর পাওয়া যাবে, এমন কোনও এজেন্টকে জানেন?"

রিজুলা জিজ্ঞেস করতেই রিসেপশনিস্ট মাথা নেড়ে বলল, "এজেন্টের কাছে কেন যাবেন? ওই টেবিলের ইংরেজি কাগজটার বিজ্ঞাপন দেখলেই পেয়ে যাবেন।"

ওরা কাগজটা দেখল। গোটা কুড়ি ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন থেকে দুটো ওদের পছন্দ হল। ফোন নম্বর ছিল। পর-পর ফোন করতেই দু' জায়গা থেকেই কীভাবে যেতে হবে জানিয়ে দিল। দুটো ফ্ল্যাটই ফার্নিশড।

রিজুলা বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, "অটো ভাড়া করা যাক।"

মাথা নাড়ল অমল, "তার আগে টাকাটা খুচরো করে নাও। তুমি তো তাই বলেছিলে। যা খরচ হবে তার হিসেব রাখবে। ফিফটি-ফিফটি করে নেব।"

তিনটে দোকান ফিরিয়ে দিল। সাতসকালে তারা হাজার টাকার নোট ভাঙিয়ে দেবে না। একমাত্র ভরসা ব্যাঙ্ক। সেটা খুলতে দেরি আছে।

অমল বলল, "এক কাজ করা যাক। হোটেলে ফিরে স্নান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সারা দিনের জন্য বেরিয়ে পড়া যাক। তখনই টাকাটা ভাঙিয়ে নেব ব্যাঙ্ক থেকে।"

রিজুলা মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

ঘরে ঢুকে অমল বলল, "আমরা যদি এখানে ফ্ল্যাট ভাড়া না নিয়ে অন্য কোথাও, যেখানে কেউ খোঁজ পেত না, চলে যেতাম, তা হলে ভাল হত।"

রিজুলা অমলের ডান হাত ধরল, "তোমার কি ভয় করছে?"

"এখানে খাবারের ব্যবসা করলে প্রচার হবেই। খবরটা আজ না হয় কাল রফিকদের কানে পৌঁছে যাবে," অমল বলল।

দু' হাতে অমলকে জড়িয়ে ধরল রিজুলা, "তোমার কোনও ভয় নেই, আমি তো আছি!"

আচমকা রিজুলার শরীরের স্পর্শ পেয়ে অমলের শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে গেল। দু' হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল সে।

রিজুলা বলল, "এদেশ থেকে চলে যাবে?"

"কী করে?"

"আমার বান্ধবী, ওই দাদুর নাতনি, টরন্টোতে থাকে। ওর ফোন, মেল আই-ডি আমার কাছে আছে। ওকে ফোন করে বললে স্পনশরশিপ লেটার পাঠাবে। সেটা দেখিয়ে কানাডায় যাওয়ার ভিসা পেয়ে যাব নিশ্চয়ই!" রিজুলা বলল।

"তারপর?" অমলের শ্বাস এক লহমার জন্য থেমে গেল।

"ওখানে গিয়ে ব্যবসা করব।"

"কিন্তু শুনেছি, বেশিদিন থাকতে দেয় না।"

"একবার ওখানে গেলে ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারব। রাজি?"

রিজুলার মাথায় মুখ রেখে অমল বলল, "রাজি।"

তখনই দরজায় শব্দ হল। রিজুলা সরে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল হোটেলের রিসেপশনিস্ট দাঁড়িয়ে আছে।

"ম্যাডাম, একটু আগে আপনারা এই নোট দিয়েছিলেন, দয়া করে বদলে দিন। নইলে আমি বিপদে পড়ে যাব।"

"কেন? কী হয়েছে?" রিজুলা অবাক।

"নেওয়ার সময় দেখে নিইনি। এখন যদি আপনারা অস্বীকার করেন..."

"আশ্চর্য! অস্বীকার করব কেন?"

"তা হলে দুটো পাঁচশো দিন।"

"কী হয়েছে নোটটায়?" রিজুলা হাত বাড়িয়ে নোট নিল।

"ম্যাডাম, ওটা জাল নোট! যে আপনাদের দিয়েছে, সে ঠকিয়েছে। ব্যাঙ্কে জমা দিলেই ওরা পুলিশে খবর দিত। আমি যখন দেখে নিইনি, তখন মালিক বলত দোষ আমারই। প্লিজ়!"

রিজুলা নোটটা চোখের উপর তুলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখেও বুঝতে পারছিল না, ওটা কেন আসল নোট নয়!

রিসেপশনিস্ট বুঝিয়ে দিল, "নোটের এই সাদা জায়গা এমনি দেখলে বোঝা যাবে না। কিন্তু আলোর সামনে ফেললে দেখবেন, সাদা অক্ষরে টাকার অঙ্কটা লেখা থাকে। এটায় তা নেই। নোটের ডান দিকের উপরের কোণে নম্বরের পিছনে হালকা করে বোল্ড লেটারে 'R' ছাপা থাকে, যা এই নোটে নেই!"

রিজুলার হাত কাঁপতে লাগল!

অমল চুপচাপ শুনছিল। এবার মিস্টার আহমেদের দেওয়া যে টাকা তার পকেটে এখনও রয়ে গিয়েছে, তা থেকে দুটো পাঁচশো টাকার নোট বের করে লোকটার হাতে দিল।

নোট দুটো পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে লোকটা তিন বার থ্যাঙ্ক ইউ বলে চলে যাওয়ার আগে বলল, "স্যার, এখনই ওই নোট ছিঁড়ে নষ্ট করে দিন। পুলিশ জানতে পারলে বিপদে পড়বেন।"

"দিচ্ছি," অমল বলল, "কিন্তু পুলিশ জানবে কী করে?"

"না, না। আমি এমনি বলছি। নষ্ট করে দিলে কোনও প্রমাণ থাকবে না!" লোকটি চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে রিজুলার দিকে তাকাল অমল।

রিজুলা দ্রুত ব্যাগ থেকে টাকার প্যাকেটটা বের করে একটা-একটা করে নোটগুলো দেখতে-দেখতে শেষ পর্যন্ত নুইয়ে পড়ল! তার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। বিছানার উপর নোটগুলোয় মহাত্মা গাঁধী হাসছেন!

অমল তার প্যাকেটের নোটগুলো বের করে দেখতে-দেখতে চেঁচিয়ে উঠল, "জাল, এই নোটগুলোও জাল!"

রিজুলার চোখে জল, "অমল আমরা মূর্খ, মহা মূর্খ!"

"কী করে বুঝব ওগুলো জাল নোট?"

"আর এই জাল নোট ব্যাগে ভরে এমনভাবে সেলাই করে আমাদের হাতে দিয়েছিল যে, ভিতরে কী আছে বুঝতেই পারিনি! ওই রফিক নামের লোকটা এটা পেতে তোমার উপর জোরাজুরি করেছিল। হয়তো ও জানত না এর ভিতরে জাল নোট আছে। জানার পর লোকটার আচরণ আর আগের মতো ছিল না, তাই না?" রিজুলা অমলের দিকে তাকাতেই অমল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

"এই নোটসমেত এয়ারপোর্টে ধরা পড়লে কী হত, ভাবতেই পারছি না!"

"ব্যাঙ্কক থেকে জাল নোট পাঠাল কেন?"

"এই একটা নোট ছাপাতে যদি তিরিশ টাকা খরচ হয়, তা হলে তার বিনিময়ে হাজার টাকা পাওয়ার আশায় ভারতে পাঠানো দরকার ছিল!"

"এখন কী হবে?" ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল অমল।

"আমি ভাবছি, নোটগুলো ওরা কী করে চালাত?" রিজুলা নিজের মনে বলল, "ওরা কি হাজার নোট তিন-চারশো টাকায় বিক্রি করে দিত? কারা কিনত? তাই যদি হয়, আমরাও তো এগুলো অল্প টাকায় বিক্রি করে দিতে পারি! কারা কেনে, তা আগে জানা দরকার," রিজুলা বলল ।

"টাকাগুলো দেখে শহরের লোক বুঝতে পারবে জাল টাকা! কিন্তু মফস্‌সল বা গ্রামের লোক বুঝতেই পারবে না। না শুনলে আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না," অমল উঠে দাঁড়াল।

"সব শেষ হয়ে গেল। সব!" ঠোঁট কামড়াল রিজুলা।

"হ্যাঁ। আমরা কোনও ব্যবসা শুরু করতে পারব না। কোথাও যেতে পারব না। আমার পকেটে এখন সামান্য টাকা পড়ে আছে যা দিয়ে কলকাতায় ফেরাও যাবে না। ওঃ, ভগবান!" অমলের কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

"টাকাগুলো তোলো," উঠে দাঁড়াল রিজুলা।

"কী করবে?" অমল তাকাল।

"বাথরুমে নিয়ে গিয়ে টুকরো-টুকরো করে কমোডে ফেলে ফ্লাশ টেনে দেব। এগুলো রাখার আর দরকার নেই," রিজুলা বলল।

"না।"

"মানে?"

"আমি এত তাড়াতাড়ি হেরে যেতে রাজি নই," টাকাগুলো আবার প্যাকেটে ভরে নিয়ে অমল নিজের সুটকেসে রাখল। তারপর বলল, "আমরা এখনই হোটেল ছেড়ে দেব।"

"কেন?" রিজুলা বলল, "কাল সকাল পর্যন্ত এখানে থাকার ভাড়া দেওয়া

হয়ে গিয়েছে।"

একটু ভাবল অমল। তারপর সুটকেস থেকে প্যাকেট দুটো বের করে একটা রিজুলাকে দিল, অন্যটা পকেটে রেখে বলল, "চলো।"

"কোথায়?" রিজুলা তাকাল।

"যেমন করেই হোক, গোটাপাঁচেক নোট ভাঙাতে হবে।"

"যদি ধরা পড়ি?"

"তখন যা মাথায় আসবে, তাই বিশ্বাসযোগ্য করে বলব।"

উপর থেকে নীচে যাওয়ার দুটো পথ। একটা সামনে রিসেপশনের সামনে দিয়ে, দ্বিতীয়টার সিঁড়ি হোটেলের এক পাশে নেমে গিয়েছে। ওরা দ্বিতীয় পথ ধরল। একটি জমাদার গোছের লোক ছাড়া কেউ ওদের যাওয়া দেখতে পেল না।

কোনও দোকানদারই হাজার টাকার নোট ভাঙিয়ে দিতে রাজি হল না। নোট না দেখেই তারা মাথা নেড়ে না বলছিল। শেষ পর্যন্ত একজন সিন্ধি ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বললেন, "সামনেই রেসকোর্স। ওখানে যান, ভাঙাতে পারবেন।"

কোনওদিন রেসকোর্সে যায়নি অমল এবং রিজুলা। খিদিরপুর, আলিপুরে যেতে কলকাতার রেসকোর্স চোখে পড়ত। কিন্তু কোনওদিন ঢোকেনি।

রিজুলা বলল, "শুনেছি, রেসে নাকি লক্ষ-লক্ষ টাকা জুয়া খেলে মানুষ! অত টাকা গুনে নেয় ওরা?"

"জানি না। আমাদের পাড়ার একজন রেসে যায়। ওকে সবাই এড়িয়ে যায় ধার চায় বলে," অমল বলল।

"চলো না। দেখা যাক," রিজুলা বলল।

মিনিটপনেরো হাঁটার পরই ওরা রেসকোর্সের গেট দেখতে পেল।

ঢোকার টিকিটের দাম বেশি নয়। অমল কাটল। ভিতরে ঢুকে সে বলল, "খুব খিদে পেয়েছে। চলো খেয়ে নিই। দোসা বিক্রি হচ্ছে, খেলে পেট ভরবে।"

খেতে-খেতে আশেপাশের লোকের সংলাপ শুনতে লাগল ওরা। জানল, টিকিট বিক্রির কাউন্টার আছে। তবে যারা বেশি টাকা খেলে, তারা বুকিদের কাছে যায়।

পেট ভরে গেলে ওরা জিজ্ঞেস করে-করে বুকিদের কাউন্টারগুলোর সামনে গিয়ে দেখল, সেখানে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। একটু পরে যে রেস শুরু হবে, তার একটি বিশেষ ঘোড়ায় বাজি লাগানোর জন্য লোকে মরিয়া হয়ে গিয়েছে। বুকিরা আগের দর কমিয়ে দেওয়ায় ঝগড়া হচ্ছে।

রিজুলা বলল, "দু' নম্বর ঘোড়াটা ওদের পছন্দ!"

অমল লক্ষ করছিল, টাকাগুলো হাতে নিয়ে এক পলক দেখেই বুকি পিছনের ব্যাগে ফেলে দিয়ে কার্ড লিখে দিচ্ছিল। ওরা টাকাগুলো খুঁটিয়ে দেখছিল না। সে একজনকে জিজ্ঞেস করল, "মিনিমাম কত খেলা যায়?"

লোকটা বলল, "একশো প্লাস ট্যাক্স। হাজারের উপর খেললে ওরা ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স নেয়। এক হাজার একশো টাকা," লোকটা নতুন ছাত্র পেয়ে জ্ঞান দিল।

অমল জিজ্ঞেস করল, "সকলে এত উত্তেজিত কেন?"

"খবর এসেছে, এই রেসে কোন ঘোড়ার জেতার চান্স বেশি। পনেরো মিনিট আগে একশো টাকায় চারশো পেমেন্ট করত। এখন সবাই এত টাকা লাগিয়েছে যে, একশো খেলে মাত্র একশো নব্বই টাকা পাওয়া যাবে! আপনারা নতুন?"

"হ্যাঁ। এই প্রথমবার এসেছি।"

"তা হলে উইন খেলবেন না। প্লেস খেলুন। না জিতুক, ঘোড়াটা ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ডের মধ্যে আসবেই। প্লেস খেলুন। একশো খেললে দেড়শো পাবেন এখনও," লোকটি তৃপ্ত মুখে চলে গেল।

অমল রিজুলার দিকে তাকাল।

রিজুলা উত্তেজিত। বলল, "এক লাখ টাকা খেলা যাবে?"

"অত খেললে সন্দেহ করবে। কুড়ি হাজার খেলি। তার মানে বাইশ হাজার দিতে হবে। দু' হাজার ট্যাক্স।"

রিজুলাকে আড়াল করে অমল বাইশটা নোট বের করে একজন বুকির কাছে গেল। সেখানে বেশ ভিড়। কেউ পঁচিশ, কেউ পঞ্চাশ, কেউ তারও বেশি টাকা বুকির হাতে গুঁজে দিচ্ছে। ওদের ফাঁক দিয়ে অমল বুকির হাতে নোটগুলো দিয়ে বলল, "টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড প্লেস। নাম্বার টু।"

লোকটা চটপট নোটগুলো গুনে নিয়ে ব্যাগের ভিতরে চালান করে কার্ড লিখল, "থার্টি থাউজ্যান্ড টু টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড, ক্যাশ!" বলে কার্ডটা অমলের হাতে দিল।

কার্ড নিয়ে ফিরে এসে অমল বলল, "এত টাকা রেস খেলার কথা ভাবতেই পারতাম না। উঃ!"

বাইশ হাজার কমল। ঘোড়াটা যদি লাস্ট হয়, তা হলেও কিছু যায়-আসে না। এখানে মোট কুড়িটা বুক আছে। ওগুলোতে খেলে চেষ্টা করো। তা হলে অনেক কমে যাবে বোঝা!" রিজুলা বলল।

শেষ পর্যন্ত পনেরোটা বুকে অমল টাকা লাগাতে পারল। তিন লক্ষ তিরিশ হাজার বেরিয়ে গিয়েছে প্যাকেট থেকে। রেস শুরু হতেই সকলে ছুটল সামনে। ওরাও তাদের পিছনে ছুটল। রেস হচ্ছে। ডান দিক থেকে ঘোড়াগুলো প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে আসছে। চার-ছয়-আট নম্বর গায়ে লেখা ঘোড়া তিনটে সকলের আগে। একেবারে শেষ মুহূর্তে দু' নম্বর লেখা ঘোড়াটা বিদ্যুতের মতো দৌড়ে এল! চারধারে চিৎকার, উত্তেজনা। ফল ঘোষণা করা হল। চার নম্বর প্রথম, দুই নম্বর দ্বিতীয়, আট নম্বর তৃতীয়। রেসুড়েদের গলায় এখন শব্দ নেই। আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল রেসকোর্স কয়েক সেকেন্ডের জন্য। লক্ষ-লক্ষ টাকা যে ঘোড়া জিতবে বলে সকলে টাকা লাগিয়েছিল, সেই ঘোড়া জেতেনি।

অমল ফিসফিস করে বলল, "আমরা পেমেন্ট পাব! প্লেস খেলেছিলাম। লোকটা বলেছিল, ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড হলেই পেমেন্ট পাব।"

"কত পাব?" রিজুলার মুখে এখন চমৎকার আলো।

হিসেব করে অমল বলল, "সাড়ে চার লক্ষ টাকা!"

উত্তেজিত রিজুলা অমলের হাত চেপে ধরল।

অমল বলল, "আমি একা সব বুকে গিয়ে পেমেন্ট নেব না। তুমি পাঁচটা বুকে যাও। আর শোনো, বলবে পাঁচশো টাকার নোট নেবে।"

"কেন?"

"না হলে ওরা আমাদের নোট থেকেই পেমেন্ট দিয়ে দিতে পারে!" হেসে ফেলল অমল, "পাঁচশো নিলে ঝুঁকিটা থাকবে না।"

পেমেন্ট দেওয়া শুরু হলে বুকিদের পিছনে ছোট-ছোট লাইন দেখা গেল। পরের রেসের বেটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। অমল লক্ষ করল, বুকির লোক দ্বিতীয় রেসের জন্য যে টাকা নিচ্ছে, তা থেকেই প্রথম রেসের পেমেন্ট দিচ্ছে। তার কার্ড হাতে নিয়ে খাতায় টিক দিয়ে ক্যাশিয়ার যখন টাকা গুণছিল, তখন অমল বলল, "পাঁচশো টাকার নোট দেবেন।"

হাজার টাকার নোট সরিয়ে দিয়ে ক্যাশিয়ার পাঁচশো টাকায় পেমেন্ট দিল।

তিন লক্ষ তিরিশ হাজার জাল টাকার বিনিময়ে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আসল টাকা পাওয়ার পর রিজুলা বলল, "চলো, বেরিয়ে যাই।"

"কেন? আরও এক লক্ষ সত্তরের বোঝা আছে!" অমল বলল।

"আর লোভ করার দরকার নেই। ওটা ভবিষ্যতে করা যাবে। ভারতে কলকাতা-বেঙ্গালুরু ছাড়া অন্য যেসব শহরে রেস হয়, সেখানে গিয়ে এই কাজটা করা যেতে পারে। এখানে আবার খেললে এদের সন্দেহ হতে পারে। চলো," রিজুলা বলল।

অমলের মনে হল, রিজুলার কথায় যুক্তি আছে। একদম নিঃস্ব হয়ে গিয়ে আবার যে পকেটে সাড়ে চার লক্ষ টাকা আসবে, তা ওরা কল্পনাও করেনি।

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলে রিজুলা বলল, "হোটেলে চলো।"

"তুমি কানাডায় ফোন করবে কখন?" অমল জিজ্ঞেস করল।

"এখন ওখানে মাঝরাত। সন্ধের সময় ওদের সকাল হবে। তখন করব।"

একটা অটো রিকশা নিয়ে হোটেলের কাছে এসে ওরা ওটাকে ছেড়ে একটা দোকান থেকে খাবার কিনে নিল। তারপর মিনিটতিনেক হাঁটতেই হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়াল! একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। সাইরেন বাজিয়ে আর একটা পুলিশ লেখা ছোট গাড়ি তার সামনে পৌঁছলে দু'জন অফিসার নেমে হোটেলে ঢুকে গেলেন।

"কী ব্যাপার?" রিজুলা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

"হোটেলে পুলিশ এল কেন?" অমল বিড়বিড় করল।

"আড়ালে চলে এসো!" রিজুলা বলল, "ওরা তো আমাদের জন্যও আসতে পারে।"

মাথা নাড়ল অমল। হতে পারে। ওই রিসেপশনিস্ট যদি তার মালিককে জাল টাকার কথা বলে থাকে, তা হলে তিনি তো পুলিশকে খবর দিতেই পারেন। কিন্তু এটা তো নিছক অনুমান! সত্যি কিনা তা যাচাই করতে হলে হোটেলে ঢোকা দরকার। এই সময় রিজুলা লোকটাকে দেখাল, "দ্যাখো, হোটেলের সেই জমাদারটা..."

অমল লোকটাকে দেখল। বয়স্ক মানুষ, গায়ে খাকি শার্ট। আজ সকালে হোটেলের দ্বিতীয় সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওকে কাজ করতে দেখেছিল। লোকটি কাছে এলে অমল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হোটেলে পুলিশ কেন ভাই?"

লোকটা হিন্দিতে বলল, "কলকাত্তাসে কোই হোটেল মেঁ আয়া, বহোত বুরা আদমি হ্যায় উয়োলোগ। পুলিশ পকড়নে আয়া," মাথা নেড়ে চলে গেল লোকটি।

রিজুলার কাছে গিয়ে অমল বলল, "হোটেলে যাওয়া বোকামি হবে। ঠিক আমাদের জন্য কিনা জানি না, কিন্তু কলকাতার লোকের জন্যই পুলিশ ওখানে গিয়েছে।"

"তা হলে কী হবে?" মুখ শুকিয়ে গেল রিজুলার। "আমার সুটকেস ওখানে।"

"সুটকেসে যা আছে, তার মধ্যে কি তোমাকে খুঁজে পাওয়ার মতো কিছু আছে? যদি এখনও ঘরে না গিয়ে থাকে..."

"না নেই। জামাকাপড় ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

"ব্যাঙ্কক থেকে ফেরার সময় এয়ারলাইন্সের ট্যাগ সুটকেসের হ্যান্ডেলে লাগিয়ে দিয়েছিল, সেটা খুলে বের করা হয়নি। ওটা থেকে পুলিশ চেষ্টা করলে আমার নাম পাসপোর্ট নাম্বার পেয়ে যেতে পারে।"

"তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি।"

অমল হাঁটতে শুরু করল। হোটেলে দ্বিতীয় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটু দাঁড়াল অমল। প্যাসেজের শেষ প্রান্তে সন্তর্পণে এসে দেখতে পেল দূরের একটি ঘর থেকে পুলিশ বেরিয়ে যাচ্ছে। ওই ঘরটিতেই যে তারা গত রাতে ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

পুলিশরা ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে যে বেয়ারাটি গত রাতে এবং আজ খাবার-চা তাদের ঘরে দিয়ে গিয়েছিল, সে রিজুলা এবং তার সুটকেস দু' হাতে নিয়ে বাইরের প্যাসেজে রাখল। দেখামাত্রই দৌড়ল অমল! লোকটা তখন দরজায় তালা দিচ্ছিল। সে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই অমল রিজুলার সুটকেসের হাতল থেকে এয়ারলাইন্সের ট্যাগটা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে রাখল।

লোকটা অমলকে দেখে হকচকিয়ে গেল, "আপ?"

"কেয়া হুয়া?" বেশ রেগে যাওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল অমল।

"হম কুছ নহি জানতা সাব। পুলিশ আপলোগোঁ কা সামান নীচে লে জানে কো বোলা।"

লোকটা সুটকেস দুটো তুলে ওপাশের সিঁড়ির দিকে এগোতেই অমল আর দাঁড়াল না। লোকটা যদি চেঁচামেচি করে অন্যদের ডাকে, তা হলে আর দেখতে হবে না। দ্বিতীয় সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে রাস্তায় চলে এসে একটা অটো দাঁড় করিয়ে উঠে বসল অমল। খানিকটা এগিয়ে রিজুলাকে তুলে নিয়ে বলল, "বাস টার্মিনাসে চলো।"

রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "বাস টার্মিনাসে কেন?"

"রেল স্টেশনে গিয়ে পুলিশ আমাদের খুঁজতে পারে।"

"হোটেলে গিয়ে কী দেখলে?"

"পুলিশ আমাদের খোঁজেই এসেছিল। এই নাও! কপাল ভাল ছিল বলে পেয়ে গিয়েছি!" লাগেজের ট্যাগটা পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিল অমল।

"থ্যাঙ্ক ইউ!" রিজুলা বলল, "কী ভয় পেয়েছিলাম! তা হলে সুটকেস, জামাকাপড়গুলো হাতছাড়া হয়ে গেল!"

"অনেক জামা কেনার টাকা এখন পকেটে এসে গিয়েছে!"

"কিন্তু বাস টার্মিনাসে যাচ্ছ কেন?"

"ওখানে গিয়ে লং ডিসট্যান্সের বাসে উঠে পড়া যাবে," অমল বলল, "এয়ারপোর্টে যাওয়ার ঝুঁকি নিলাম না।"

বেঙ্গালুরু থেকে সন্ধের সময় যে ভলভো বাসগুলো পুণেতে যায়, সেই বাসের টিকিট কাটল। কিন্তু তখনও বাস ছাড়তে কয়েক ঘন্টা দেরি। বাস টার্মিনাসে বসে থাকাও নিরাপদ নয়। সময় কাটাতে ওরা আর একটা অটো নিয়ে শহরটার চারপাশে ঘুরে এল। বাস ছাড়লে অমল বলল, "খুব টায়ার্ড লাগছে।"

"আমারও।"

"তুমি কিন্তু কানাডায় কথা বললে না!"

"সুযোগ পেলাম কখন? দাঁড়াও," রিজুলা মোবাইলে এসএমএস করল। মিনিটপনেরো পর তার মোবাইলে কল এল। অমল শুনল, রিজুলা তার কানাডাবাসিনী বান্ধবীকে অনুরোধ করল স্পনসর লেটারের ব্যবস্থা করে দিতে। ওদিক থেকে সব শুনে বলল, "আমি এখনই পাঠাচ্ছি। একটা মেল আই-ডি দেব, তাতেই সব পাঠিয়ে দাও।"

ফোন বন্ধ করে রিজুলা বলল, "তোমার পাসপোর্টটা দাও।"

"কেন?"

"নম্বর, ঠিকানা পাঠাতে হবে। ওটা লাগবে।"

সব কিছু লিখে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল রিজুলা।

বাস ছুটে চলেছে রাতের নির্জন অন্ধকারে।

ভোর চারটের সময়, পুণে যখন বেশি দূরে নেই, তখন বাস থেমে গেল। বেশিরভাগ যাত্রী ঘুমোচ্ছিলেন। কিন্তু যারা জেগেছিলেন এবং প্রথম দিকে বসেছিলেন তাদের কেউ-কেউ 'পুলিশ'-'পুলিশ' বলে চিৎকার শুরু করে দিল। অমল দেখল, দুটো লোক বাসের দরজা খুলে দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। উঠে দাঁড়াতেই ড্রাইভারের সামনের কাচ দিয়ে হেডলাইটের আলোয় একটা বড় পুলিশ ভ্যান আর একটা জিপ দেখতে পেল। গোটাদশেক পুলিশ এগিয়ে আসছে বাসের দিকে।

ওপাশের এক যাত্রী বলে উঠলেন, "অভি শুরু হোগা খেল!"

"খেল মানে?" অমল লোকটার দিকে তাকাল।

"হ্যারাসমেন্ট!"

পুলিশের নির্দেশে বাসের ভিতরের আলো জ্বেলে দিল ড্রাইভার।

আবার বসে পড়ল অমল। তারপর নিচু গলায় বলল, "ওরা আমাদের জন্য এসেছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু জাল টাকাগুলো সঙ্গে রাখা উচিত হবে না।"

"কী করবে?" নিচু গলায় প্রশ্ন করল রিজুলা।

"সিটের নীচে ফেলে দিচ্ছি।"

"আমাকে দাও।"

"ধরা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"পড়ব না। জলদি দাও, ওরা বাসে উঠছে।"

হাজার টাকার নোটগুলো কমে যাওয়ায় প্যাকেটটা চেপ্টে গেল। অমল পকেট থেকে সেটা বের করে রিজুলার হাতে দিতেই সে জানলাটা সামান্য খুলে বাইরে ছুড়ে দিল। এপাশে পুলিশ নেই। আড়চোখে দেখল, অন্ধকারে সাদা পাখির মতো নোটগুলো বাতাসে ভাসতে-ভাসতে পাশের মাঠের দিকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে পুলিশ সামনের যাত্রীদের জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। কাউকে-কাউকে ব্যাগ খুলতেও বাধ্য করছে। একজন যাত্রীকে ওরা নামিয়ে নিয়ে গেল। লোকটা চেঁচিয়ে যা বলছিল তার বাংলা হল, 'এই সুটকেস আমার নয়। যাদের সুটকেস তারা বাস থামামাত্র পালিয়ে গিয়েছে।' পুলিশ সেকথায় কান দিল না।

"হোয়ার ইজ় ইওর লাগেজ?" লাঠি হাতে একজন অফিসার এসে সামনে দাঁড়াল।

অমল বলল, "উই ডোন্ট হ্যাভ এনি লাগেজ।"

"ইউ আর ফ্রম?"

"বেঙ্গালুরু।"

ঠিক সেই সময় বাসের দরজার উল্টো দিকে একটা পুলিশ চিৎকার করে উঠল। সম্ভবত জল বিয়োগ করতে গিয়েছিল সে, গিয়ে মাঠে টাকা পড়ে থাকতে দেখেছে। ভাষা বোধগম্য না হলেও দেখা গেল, সব পুলিশ সেদিকে ছুটছে টাকা কুড়োতে!

অফিসার চিৎকার করল, "বাসের কেউ কি টাকা ফেলেছে?"

কেউ কথা বলল না।

এবার অফিসারও নীচে নেমে টাকা কুড়িয়ে আনার কাজটা তদারকি করতে লাগল। বাসের ড্রাইভার যাওয়ার অনুমতি চাইলে লাঠি নেড়ে সেটা দিলেন।

বাস চলতে শুরু করলে অমল বলল, "মিছিমিছি ওগুলো ফেলে দিলে! ওরা নিশ্চয়ই আমার পকেট সার্চ করত না।"

"করলে কী হত? ওই জাল টাকা নিয়ে ওরা মত্ত হয়ে পড়ল বলে আর সার্চ করল না। যখন বুঝতে পারবে, টাকাগুলো ভাঙানো যাবে না, তখন কী অবস্থা হবে ভাব! আমরা যেন তার আগেই পৌঁছে যাই!" রিজুলা অমলের কাঁধে মাথা রাখল।

পুণের হোটেলে তিনটে দিন আলস্যে কাটল ওদের। এর মধ্যে খবরের কাগজ দেখে ওরা জেনেছিল, ওই শহরে রেসকোর্স আছে। জানার পর অমল বলেছিল, "কী বোকামি করলে বলো তো! ওই টাকায় রেস খেললে ওখানে অন্তত দু' লক্ষ জেনুইন টাকা পেয়ে যেতাম!"

রিজুলা হেসে সেদিনের কাগজের পাঁচ নম্বর পাতাটা দেখিয়ে বলল, "পড়ো...আচ্ছা, আমিই পড়ছি — বেঙ্গালুরু-পুণে হাইওয়েতে একটি বাস থেকে কে বা কারা এক হাজার টাকার নোট ফেলে দিয়ে গিয়েছে। টাকার পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকার কাছাকাছি হবে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এই নোটগুলো জাল। কয়েকদিন আগে বেঙ্গালুরু রেসকোর্সে দু'জন অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে বিপুল পরিমাণ ওরকম টাকা বেটিং করে আসল টাকা জিতে নিয়ে গিয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, এরা কলকাতা থেকে এসেছে। এরাই কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রে জাল নোট ব্যবহার করছে। পুলিশের আরও সন্দেহ, ওরা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে জাল নোট হাইওয়েতে ফেলে গিয়েছে। মহারাষ্ট্র পুলিশ এদের সন্ধান করছে।" পড়ার পর রিজুলা জিজ্ঞেস করল, "রেসকোর্সে গেলে কী হত?"

"সর্বনাশ!" অমল বলল, "খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছি!"

ওরা যেদিন পুণে থেকে মুম্বই আসবে, সেদিন সকালে মেল এল। হোটেলের কাছে একটা সাইবার কাফেতে দু' বেলা গিয়ে মেল চেক করত রিজুলা। যাওয়ার দিন সকালে তার মেল আই-ডিতে দুটো স্পনসরশিপ লেটার দেখতে পেয়ে বের করে নিল। উত্তেজনা তখন তীব্র। দুটো চিঠিতেই তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বান্ধবীর বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য। তাদের থাকা-খাওয়ার সব দায়িত্ব বান্ধবী নেবে। সঙ্গে বান্ধবী তার ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট, আয়করের প্রমাণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। রিজুলা সেগুলো নিয়ে হোটেলে ফিরে এসে অমলকে সব জানিয়ে বলল, "মুম্বই নয়, আমাদের এখনই দিল্লি যেতে হবে!"

"দিল্লি কেন?" অমল হকচকিয়ে গেল।

"কানাডিয়ান ভিসা ওখান থেকেই দেয়। অন্তত কলকাতার পাসপোর্ট যে দিল্লির কানাডিয়ান দূতাবাসে পাঠানো হয়, আমি জানি," রিজুলা বলল।

"ও, কিন্তু দিল্লির ট্রেনের টিকিট পেতে কত দিন লাগবে কে জানে! আজকের টিকিট তৎকালেও পাওয়া যাবে না।"

"ট্রেনে গিয়ে সময় নষ্ট করব কেন? চলো এয়ারপোর্টে যাই।"

"প্লেনে? অনেক টাকা লাগবে।"

"লাগুক। আমাদের পকেট থেকে যাচ্ছে না!"

হোটেল ছাড়ার আগে রেসকোর্স থেকে পাওয়া টাকা দু'ভাগ করে নিল ওরা। অমলেরও মনে হল, একজনের কাছে থাকলে বেশি ঝুঁকি নেওয়া হবে। এয়ারপোর্টে যেতে-যেতে ওরা ঠিক করল, একসঙ্গে টিকিট কাউন্টারে যাবে না। আলাদা-আলাদা টিকিট কেটে বোর্ডিং কার্ড নেবে যখন, তখন কেউ কাউকে চিনবে না। পুলিশ যদি এয়ারপোর্টে নজর রাখে, তা হলে দু'জন ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে থাকলে সন্দেহ করতে পারে।

নিখুঁত অভিনয় করল রিজুলা। একজন বৃদ্ধাকে সাহায্য করার সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে লেপ্টে থাকল। প্লেনের ভিতরেও বসল বৃদ্ধার পাশে। অমলের দিকে তাকাল না।

দিল্লিতে নেমে ট্যাক্সির কাছে গিয়ে অমল জিজ্ঞেস করল, "এর আগে আমি এখানে আসিনি। তুমি এসেছ?"

"হ্যাঁ, একবার এসেছি। চলো।"

ট্যাক্সি নিল রিজুলা। একটা হোটেলে উঠল তারা। ঘর পেতে অমলকে তার পাসপোর্ট দেখাতে হল। কাছেই আজমল খাঁ মার্কেট। সেখানে গিয়ে কয়েক দিন চালানোর মতো পোশাক কিনে নিল ওরা।

রিজুলা বলল, "বেশি কেনার দরকার নেই। কানাডায় গেলে আর এক প্রস্থ কিনতেই হবে।"

এত দিন একসঙ্গে থাকলেও যে দূরত্ব রেখে ওরা চলছিল, তা আজ রাতে দু'জনের চাওয়ায় দূর হয়ে গেল। জীবনে প্রথমবার কোনও নারীর শরীরে ডুবে যেতে-যেতে অমলের মনে হল রিজুলাকে ছাড়া সে আর কিছু ভাবতেই পারছে না।

বাথরুম থেকে রাতপোশাক পরে বেরিয়ে এসে রিজুলা বলল, "কী হবে?"

"কী হবে মানে?"

"উঃ, আমি ভাবিনি বলে তুমিও ভাববে না?"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"যদি আমি কনসিভ করি?" চোখ বড় করল রিজুলা।

"অ্যাঁ?" হাঁ হয়ে গেল অমল।

"কোনও প্রোটেকশন না নিয়ে..." মাথা নাড়ল রিজুলা, "ভগবান, কিছু যেন না হয়। কাল সকালেই ট্যাবলেট কিনতে হবে!"

অমল মিইয়ে গেল। বাকি রাতটা সে রিজুলার কাছাকাছি হল না। কীরকম ভয়-ভয় করছিল তার!

কানাডিয়ান দূতাবাসে পৌঁছে ফর্ম ভর্তি করে কাগজপত্র, ভিসা ফিসমেত পাসপোর্ট জমা দিল ওরা। পরের দিন ইন্টারভিউ। বিকেলে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলল রিজুলা। অমল পাশে দাঁড়িয়েছিল। ওপাশের একটা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে রিজুলা অমলের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, "এখনও ট্রেনিং চলছে। তবে হ্যাঁ, ও আমার ভাল বন্ধু।"

রাতে হোটেলের ঘরে বসে অমল কথাটা তুলল, "কীসের ট্রেনিং?"

"তোমাকে মানুষ করার।"

"তার মানে, আমি মানুষ ছিলাম না?"

"গত রাত পর্যন্ত নয়। আমার মতো একটা মেয়েকে রাতের পর রাত কাছে পেয়েও যে বরফ হয়ে থাকে, তাকে কতটা মানুষ বলা যায়!" হেসে উঠল রিজুলা, শব্দ করে।

"তুমি ভদ্রতা, সৌজন্যবোধকে পাত্তা দাও না?"

দু'হাতে অমলকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল রিজুলা, "না দিলে তোমার সঙ্গে এভাবে থাকতাম?"

অমল সতর্ক হল। কাল রাতের ভুল আজ আর করবে না। সে কথা ঘোরাল, "কানাডায় যেতে কত খরচ হবে?"

"সব মিলিয়ে পার হেড আশি হাজার মতো। তাই তো শুনলাম।"

"অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে।"

"তা যাক। বাকি টাকাগুলো কানাডিয়ান ডলারে কনভার্ট করতে হবে।"

"তার রেট কত?"

"গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। তুমি এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না।"

অমল হাসল, "আমি ভাবতেই পারছি না!"

"কী ভাবতে পারছ না?"

"আমি কানাডায় যাচ্ছি। যে কখনও কলকাতার বাইরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেনি, সে আচমকা ঢাকা গেল, ব্যাঙ্কক থেকে ঘুরে এল। এখন কানাডার দিকে পা বাড়াচ্ছে। কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে!"

"যখন হয়, এভাবেই হয়। জীবন এরকমই।"

"কিন্তু কানাডায় যাওয়ার আগে মাকে জানাতেই হবে।"

"এখন নয়। প্লেনে ওঠার ঠিক আগে জানিও। তোমাদের বাড়ির ফোনে কেউ আড়ি পাতছে কিনা, তা আমরা জানি না," রিজুলা সরে গেল নিজের খাটে, "তুমি কিন্তু তোমার বান্ধবীর খোঁজখবর করছ না!"

সঙ্গে-সঙ্গে সোহাগের মুখ মনে পড়ে যেতেই মোবাইল বের করে নম্বর টিপল। যন্ত্রটা কানে চেপে হতাশ হয়ে দ্বিতীয় নম্বর থেকেও একই বার্তা পেয়ে বলল, "আশ্চর্য! দাদা-বোন, দু'জনেই ফোন বন্ধ করে রেখেছে? এটা নিশ্চয়ই ওদের মায়ের নির্দেশ! সোহাগ ভালই আছে, কী বলো?"

"নিশ্চয়ই!" মাথা নাড়ল রিজুলা, "আচ্ছা, কানাডায় গিয়ে তুমি ওকে মিস করবে না? কষ্ট হবে না?"

"যখন ওর কথা মনে পড়বে, তখন খারাপ নিশ্চয়ই লাগবে। অনেক বছরের অভ্যেস তো! তুমি যখন আমার জীবনে আসোনি, তখন ও আমার একমাত্র ওয়েল উইশার ছিল। কিন্তু ওই পর্যন্ত, তার চেয়ে বেশি নয়!" অমল বলল।

রিজুলা হাসল, "আমি বলি কী, তুমি বরং থেকেই যাও!"

"মানে?" চমকে উঠল অমল।

"তোমার এমন মেয়ের ভালবাসা দরকার, যে তোমাকে জড়িয়ে থাকবে না। তোমার ভাল চাইবে, তোমার কথা শুনবে। অথচ তোমাকে দায়িত্ব নিতে বলবে না। তুমি এরকম সম্পর্কে অভ্যস্ত ছিলে। শুনেছি, বিদেশে বাস করতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। শুধু বাইরে নয়, বাড়িতেও অনেক দায়িত্ব

নিতে হয়। তোমার মনেই হতে পারে, কেন এলাম?" রিজুলা তাকাল।

"দূর!" হাসল অমল, "তুমি ভুল-ভাল ভাবছ। এসব কিছুই হবে না।"

ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে প্রশ্নবাণে জেরবার হয়ে গেল দু'জনে! যার বিয়ে, তার সঙ্গে কী সম্পর্ক? দু'জনের সঙ্গে তার কত দিনের আলাপ? ওরা যখন কলকাতার ঠিকানা দিয়েছে, তখন সেখানে কী কাজ করে? আয়কর দেয় কিনা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে কিনা? তার প্রমাণপত্র দেয়নি কেন? ওরা কি কানাডায় গিয়ে বৈধ কাগজ ছাড়াই সেখানে থেকে যাওয়ার প্ল্যান করছে? অমল বেশিরভাগ প্রশ্নের জবাব দিতে পারছিল না। কারণ, উচ্চারণের জন্য প্রশ্নগুলো বোধগম্য হচ্ছিল না! হলেও উত্তরটা বাংলা থেকে মনে-মনে ইংরেজিতে তর্জমাটাই ঠিক জুতসই ভাবে করতে পারছিল না! কিন্তু রিজুলা বেশ স্বচ্ছন্দ জবাব দিচ্ছিল। যার বিয়ে, তার সঙ্গে সে একসঙ্গে স্কুলে-কলেজে পড়েছে। একই পাড়ায় থেকেছে। সে পড়াশোনা শেষ করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। যেহেতু টিউশনি করে হাতখরচ চালায়, তাই আয়কর দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তার নামে যেহেতু কোনও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নেই, তাই কোনও কাগজ দেওয়ার সুযোগ পায়নি। তা ছাড়া কানাডায় গিয়ে থেকে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ, সে যাকে ভালবাসে, যাকে বিয়ে করবে, সে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যাবে না।

যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন, তিনি অমলকে বাইরে যেতে বললেন। কারণ, রিজুলাকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন। অমল বেরিয়ে গেলে ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন হল, "অমলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?"

রিজুলা বলল, "পরিচিত। আমরা একই কলেজে পড়তাম।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি দুঃখিত, আপনার সঙ্গীকে ভিসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ওর কথায় আমি স্যাটিসফায়েড নই।"

"আমার..."

ভদ্রলোক হাসলেন, "বিকেল তিনটের সময় এসে পাসপোর্ট নিয়ে যাবেন। আপনাকে সাতদিনের মধ্যে কানাডা থেকে ফিরে আসতে হবে।"

বাইরে দাঁড়িয়েছিল অমল। রিজুলা বেরিয়ে আসতেই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী বলল?"

"ব্যক্তিগত প্রশ্ন।" রিজুলা বলল।

"শুনি।"

"তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? ওখানে গিয়ে আমরা বিয়ে করব না স্টে-টুগেদার...ছেড়ে দাও।" রিজুলা হাসল।

"ভিসা তো পাসপোর্টে ছাপ মেরে দেবে। কখন দেবে?"

"কাল বিকেলে।"

"অনেক সময় নেয় তো এরা! মিস্টার আহমেদ তো ঝটপট ভিসা করিয়ে আনেন," অমল বলল।

"অমল, ব্যাঙ্কক-বাংলাদেশ আর কানাডার মধ্যে তফাত আছে। চলো, তোমাকে আজ খাওয়াব।" রিজুলা বলল।

দামি রেস্তরাঁয় খেতে-খেতে অমল আলোচনা করছিল, "অন্তত একজোড়া জিনস, চারটে শার্ট, একটা জ্যাকেট কেনা দরকার।"

"কিনে নাও। শোনো, হাতে সময় নেই। তুমি যাও কেনাকাটা করতে। আমার জন্যে দুটো টপ কিনবে। সাদা, ফ্রি সাইজ। আমি ততক্ষণে টাকাগুলো কানাডিয়ান ডলারে পাল্টে নিই," রিজুলা বলল।

খাবারের বিল মিটিয়ে দিল রিজুলা।

"হোটেলের চার্জ, টিকিটের দামের সঙ্গে কিছু টাকা আলাদা করে রেখে বাকিটা ডলার করবে," অমল বলল।

"তা হলে তুমি একবার টয়লেটে যাও।"

"কেন?" অবাক হলে অমল।

"এখানে সকলের সামনে অত টাকা বের করে গুনবে?"

"ওঃ, তাই তো!" উঠে দাঁড়াল সে।

"হাজারদশেক পকেটে রেখে বাকিটা এনে দাও। আমি টিকিট বুক করে ডলার কিনে ফিরছি।"

"ডলার কোথায় পাবে?"

"কনট প্লেসে একটা দোকান আছে।"

"কবেকার টিকিট কাটবে?"

"তুমি বলো?" রিজুলা তাকাল।

"বেশি দেরি করে লাভ নেই। কাল পাসপোর্ট পেলে, কালই। কোন ফ্লাইটে যেতে চাইছ?"

"দেখি। বোধ হয় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হয়ে টরন্টো।"

অমল চলে গেল টয়লেটে। সেখানে লোক থাকায় ল্যাট্রিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। দশ হাজার টাকা সরিয়ে প্যাকেটটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এসে মুখে জল দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখল সে। তারপর হেসে প্রতিবিম্বকে বলল, "অমলবাবু, আপনি কাল টরন্টোয় যাচ্ছেন!"

ফিরে এসে প্যাকেটটা রিজুলাকে দিয়ে অমল জিজ্ঞেস করল, "পাসপোর্ট না দেখলে ওরা ডলার বা টিকিট দেবে?"

"না, দেবে না। কিন্তু যদি বুক করে না রাখি, তা হলে কাল হয়তো পাওয়াই যাবে না। মিছিমিছি রিস্ক নেওয়ার কী দরকার!" রিজুলা বলল, "তুমি কেনাকাটা করে ছ'টার মধ্যে হোটেলে ফিরে এসো। এখন সোওয়া দুটো বাজে। কাল মাঝরাতে ফ্লাইট, আজ ঘুমিয়ে নাও।"

"কোথায় কিনতে যাব?"

"আমরা যেখানে আছি, আজমল খাঁ মার্কেটে। অটো ধরে চলে যাও।" অমলের হাত স্পর্শ করল রিজুলা, "সাবধানে যেও।"

ঠিক তিনটের সময় দূতাবাসে গিয়ে জমা দেওয়া রসিদ দেখাতেই পাসপোর্ট পেয়ে গেল রিজুলা। খুলে দেখল, তাকে ঠিক সাতদিনের জন্য ভিসা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে তাকে ফিরে আসতে হবে। নইলে ওদেশে আইন ভেঙে থাকতে হবে। রিজুলা হাসল। তারপর অমলের পাসপোর্ট চাইল। জমা দেওয়ার রসিদ তার কাছেই ছিল। ওটা হাতে পাওয়ার পর দেখল বাংলাদেশ, তাইল্যান্ডের ভিসার পর পাতাগুলো শূন্য। ওকে যেমন ভিসা দেওয়া হয়নি, তেমনই আবেদন বাতিল করা হয়েছে, তা-ও লেখেনি।

ঘণ্টাদু'য়েকের মধ্যে প্লেনের কনফার্মড টিকিট এবং কানাডিয়ান ডলার রিজুলার পকেটে চলে এল। সে যখন ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে পৌঁছল, তখন সময় সন্ধে ছ'টা। রিসেপশনিস্টের হাতে অমলের পাসপোর্ট দিয়ে একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে রিজুলা লিখল, 'কিছু করার নেই। দুঃখিত। তুমি ভিসা পাওনি, তাই একাই যাচ্ছি। তুমিও একা থাকবে না। এদেশে তোমার ওয়েল উইশার তো আছে।'

আজমল খাঁ মার্কেটে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে নিজের জামাপ্যান্ট কেনার পর রিজুলার টপ কিনতে আরও খানিকটা সময় গেল। অন্যমনস্ক হয়ে অমল যখন মার্কেট থেকে বেরচ্ছে, তখন আচমকা মনে হল, একটা লোক তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে! দিল্লিতে তার কোনও চেনা মানুষ নেই। তা হলে ওই লোকটা কে? বাঙালি যে নয়, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। অমল হাঁটতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর কিছুই বোঝেনি এমন ভান করে তাকিয়ে দেখল, লোকটা তার পিছন-পিছন মোবাইলে কথা বলতে-বলতে হাঁটছে। চোখ তার উপর।

ও কি রফিকের লোক? তাই যদি হয়, তা হলে তাকে চিনবে কী করে? সঙ্গে-সঙ্গে খেয়াল হল, হকসাহেব যেমন তার ছবি মেলে রফিককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, রফিকও তেমনি বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা তার দলের লোকদের ছবি পাঠিয়ে দিতে পারে! মেরুদণ্ড কনকন করে উঠল অমলের! সে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখল, লোকটা উল্টো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হলেও চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে না। এই অবস্থায় হোটেলে গেলে লোকটা ঠিক পৌঁছে যাবে। সেটা কখনওই হতে দেওয়া যাবে না। এই সময় উল্টো দিক থেকে একটা বাস এসে থামল, কয়েকজন নামতেই অমল ঝটপট উঠে পড়ল বাসে। ওই দূরত্ব থেকে লোকটা দৌড়ে এসেও বাসে উঠতে পারেনি। বাস ছুটছে জোরে।

অমল কন্ডাক্টরের হাতে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে হিন্দিতে বলল, "এটা রাখুন, নামার সময় টিকিট দেবেন।"

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নামবেন?"

"এখনও জানি না!"

সে বাসের পিছনের কাচ দিয়ে তাকিয়ে দেখল, কোনও গাড়ি বা অটো ছুটে আসছে না। কিন্তু লোকটা নিশ্চয়ই আসছে। এই বাসে বসে থাকা বোকামি হবে। পরের স্টপে বাস থামতেই অমল দৌড়ে নেমে একটা দোকানের ভিতরে ঢুকে গেল। বাস চলে যাওয়ার মিনিটখানেক বাদে সে লোকটাকে দেখতে পেল। তীব্র গতিতে ছুটে আসা একটা অটোতে সোজা

হয়ে বসে সামনে তাকিয়ে আছে। চোখের সামনে দিয়ে অটো বেরিয়ে গেল বাসের উদ্দেশে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল অমল। লোকটা নিশ্চয়ই বাসে উঠবে। তাকে দেখতে না পেয়ে কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলেই জেনে যাবে, সে কোথায় নেমে গিয়েছে। অমল আর দাঁড়াল না। সন্ধে সাতটা বাজলেও দিল্লিতে অন্ধকার নামেনি। উল্টোদিক থেকে অটো ধরে সে হোটেল ছাড়িয়ে গিয়ে নেমে পড়ল। না, পিছনে কোনও অনুসরণকারী নেই। ঘটনাটা বললে রিজুলা নিশ্চয়ই তাকে বাহবা দেবে। কিন্তু আজ রাতেই হোটেলে থেকে দিল্লির অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া উচিত তাদের। পারলে এয়ারপোর্টের কাছে কোনও হোটেলে।

সে রিজুলাকে ফোন করল। ফোন বন্ধ। এতক্ষণে ওর হোটেলে ফিরে আসার কথা। হয়তো স্নান করছে। হোটেলে ঢুকে রিসেপশনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রিসেপশনিস্ট ডাকল, "স্যার।"

সে কাছে গেলে ঘরের চাবি আর পাসপোর্ট এগিয়ে দিল।

অবাক হয়ে গেল অমল, "এই পাসপোর্ট কোথায় পেলে?" পাসপোর্ট খুলে সে নিজের ছবি দেখল, "এটা তো..."

"স্যার, ম্যাডাম দিয়ে গিয়েছেন।"

"ম্যাডাম?" হকচকিয়ে গেল অমল।

"হ্যাঁ। উনি আপনার জন্য একটা নোটও রেখে গিয়েছেন," রিজুলার রেখে যাওয়া ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট।

রিজুলার লেখা পড়ল অমল, 'কিছু করার নেই। তুমি ভিসা পাওনি। তাই একাই যাচ্ছি। তুমিও একা থাকবে না। এদেশে তোমার ওয়েল উইশার তো আছে।' লেখাগুলো যেন জড়িয়ে দুটো কালো লাইন হয়ে গেল।

"কখন এসেছিল?" নিজের কণ্ঠস্বর অচেনা মনে হল অমলের।

"এক ঘন্টা আগে।"

"কোথায় গিয়েছে, বলে গিয়েছে?"

"না স্যার।"

পাসপোর্টটা আবার দেখল অমল। না, কানাডার ভিসার ছাপ কোনও পাতায় নেই। সে মাথা নেড়ে রিসেপশনিস্টকে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"আপনি কি থাকবেন?"

"নিশ্চয়ই। আজ অবধি অ্যাডভান্স দেওয়া আছে, তাই না?"

জামাপ্যান্টের ব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই মনে হল, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। কিন্তু কোথায় খুঁজতে যাবে সে রিজুলাকে? যদি কালকের ফ্লাইটে যায়, তা হলে আজ রাতটা ও তাকে ছেড়ে গেল কেন? হঠাৎ মাথায় এল, রিজুলা আজ রাতেই চলে যাচ্ছে না তো! মাঝরাতে ফ্লাইট হলে এখন এয়ারপোর্টে গেলে নিশ্চয়ই ওকে পেয়ে যাবে সে।

ট্যাক্সি নিল অমল। কেনাকাটা করার পরেও তার পকেটে এখনও কয়েক হাজার টাকা আছে। হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল। রিজুলাকে ফোন করার পর সুইচ অফ করতে ভুলে গিয়েছিল। নম্বর দেখে ঢোঁক গিলল সে। কেটে দেবে? কোনও লাভ হবে না তাতে। সে ফোন অন করে 'হ্যালো' বলল।

"তুমি দিল্লিতে কী করছ?" রফিক বিকৃত গলায় জিজ্ঞেস করল।

"খুঁজতে এসেছি। টাকাটা হাতিয়ে মেয়েটা দিল্লিতে এসেছে।"

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে রফিক জিজ্ঞেস করল, "দেখা পেয়েছ?"

"খবর পেয়েছি। কিছুক্ষণ পরে কনফার্ম করতে পারব।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"এয়ারপোর্টে।"

"সব মিথ্যে কথা! ওই টাকায় তোমরা রেস খেলেছ। পুণের রাস্তায় টাকা উড়িয়েছ। টাকাগুলো যে আসল নয়, তোমরা জেনে গিয়েছ। তুমি আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছ।"

"বেইমানি তোমরা করোনি? জাল টাকা আমার হাতে পাঠিয়ে হকসাহেব মুনাফা চাননি? আমি পুলিশকে সব বললে তোমরা ফেঁসে যাবে!" চিৎকার করে বলল অমল।

রফিক ফোন কেটে দিল।

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হয় না। অমলকে ভিজিটার্স লাউঞ্জে যাওয়ার জন্য টিকিট কাটতে হল। রিজুলা ভিজিটার্স লাউঞ্জে নেই। যেসব যাত্রী বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁদের পাসপোর্ট-টিকিট চেক করে ভিতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে। এখন রাত সাড়ে ন'টা। অমল শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে ভিতরের যাত্রীদের দেখছিল। প্রচুর পুরুষ-মহিলা রয়েছেন সেখানে। রিজুলাকে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে কখন কোন ফ্লাইট ছাড়বে, তার ঘোষণা করা হচ্ছে। মরিয়া হয়ে অমল তাদের অফিসে পৌঁছে গেল। কিন্তু তারা কোনওরকম সহযোগিতা করল না। ওই সিস্টেমে ব্যক্তিগত ঘোষণা করা যাবে না।

ভিজিটার্স লাউঞ্জের একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। নিজেকে ভয়ঙ্কর একলা মনে হচ্ছিল। খুব দুর্বল লাগছিল শরীর। মোবাইল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে সোহাগের নম্বর টিপল অমল। একই কথা, সুইচড অফ! রাত এগারোটা নাগাদ সামনে বেশ ভিড় দেখতে পেল। যাত্রীরা চলে যাওয়ার আগে সীমানার ওপাশে দাঁড়িয়ে আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। অমল উঠে দাঁড়াল। একটু এগিয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ চমকে উঠল সে। রিজুলা! রিজুলা ভিতরের দিকে এগোচ্ছে। সে শরীর কাঁপিয়ে চিৎকার করল, "রিজুলা!" সবাই অবাক হয়ে তাকালেও অনেক দূরের মহিলাটি মুখ ফেরাল না। শ্বাস ফেলল অমল, না, বোধ হয় রিজুলা নয়।

থপথপে পায়ে ফিরে যাওয়ার জন্য গেটের দিকে এগোতেই মোবাইল জানান দিল। একটা এসএমএস এসেছে। করেছে শোভন। শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল তার! দ্রুত বোতাম টিপে মেসেজটা চোখের সামনে আনতেই পৃথিবীটা সাদা হয়ে গেল, 'সোহাগ আজ সন্ধে সাড়ে সাতটায় আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

অমলের মনে হল, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে গেল। পুলিশের উর্দিপরা একজন লোক সেটা কুড়িয়ে ওর হাতে দিয়ে বলল, "আপনার শরীর খারাপ, বসুন!"

মাথা নাড়ল অমল। কোনওরকমে গেটের বাইরে এসে সে আকাশের দিকে তাকাল। কেউ নেই, কেউ রইল না। তারপর মুখ তুলতেই সে শক্ত হয়ে গেল। সেই লোকটা, যাকে প্রথম দেখেছে আজ বিকেলে আজমল খাঁ মার্কেটে, একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

এক দৌড়ে, শরীরে যেটুকু শক্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল, তা একত্রিত করে এয়ারপোর্টের পুলিশের কাছে পৌঁছে সে আর্তনাদ করল, "আমাকে বাঁচান, প্লিজ, সেভ মি। আমি সব কথা বলতে চাই, প্লিজ, সেভ মি।" লোকগুলো অবাক হয়ে তাকে বসতে বলল। মুখ ফিরিয়ে অমল দেখল, রফিকের লোকটা উধাও হয়ে গিয়েছে। একটা বড় শ্বাস ফেলে সে বলতে শুরু করল, "আমার নাম অমল। খুব সাধারণ ঘরের ছেলে আমি..."